সূর্যমুখী

এই লেখকের—

উপন্যাস ॥ ঘণ্টাফটক, মাটকোঠা, লাল পাথর, উত্তরণ, মেঘডম্বর, স্বগতোক্তি, সমান্তরাল

নাটক ॥ প্রত্যাবর্তন

কিশোর উপন্যাস ॥ ছুট্ ('জন্মতিথি' নামে ছায়াচিত্রে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত।)

ছোটদের নাটক ॥ কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ, তেপান্তর

·········সামাজিক নাটক·········

সূর্যমুখী

'ঘণ্টাকটক' উপন্যাসের নাট্যরূপ·

প্রশান্ত চৌধুরী

গুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট
কলিকাতা ৬

প্রকাশক :
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি. এস্-সি.
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্
কলিকাতা ৬

মুদ্রেক :
শ্রীকালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৬, চালতা বাগান লেন
কলিকাতা ৬

প্রথম সংস্করণ :
ভাদ্র, ১৩৬৭

দাম : ২'০০

‘মিলন-ছত্র’র

নাটুকে বন্ধুদের হাতে

১৫।১এ, শ্যামাপুকুর লেন,
কলিকাতা-৯

প্রশান্ত চৌধুরী

এ নাটকের রচনাকাল ১৯৫১। তখন নাম ছিল 'দুই-মহল'। সম্প্রতি দেখছি, 'দুই-মহল' নামের চাপরাশ লাগিয়ে আরেক নাটক এসে হাজির হয়েছে। নামটার উপর আমার অধিকার জোরদার থাকা সত্ত্বেও নামটা বদলালুম; অভিনয়েচ্ছুদের অসুবিধায় ফেলতে চাই না বলেই।

১৯৫২র প্রথম এবং পরের বছর 'মিলন-ছত্র' কর্তৃক দ্বিতীয়বার এ-নাটকের অভিনয় হয়েছিল রঙমহল রঙ্গমঞ্চে। সেই দু-রাত্রের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কয়েকজনের নাম দেওয়া হল—

অনন্তনারায়ণ	...	কমল মিত্র ও জয়ন্ত চৌধুরী
দর্পনারায়ণ	...	জয়ন্ত চৌধুরী ও প্রশান্ত চৌধুরী
রক্ষিত মহাজন	...	প্রশান্ত চৌধুরী
নেপাল রক্ষিত	...	সলিল দত্ত
পঞ্চানন	...	কমল মজুমদার
মুস্কিল আসান	...	ঋষি চৌধুরী
গঙ্গাপ্রসাদ	...	অমর চট্টোপাধ্যায়
নায়েব	...	সোমেন চট্টোপাধ্যায়
ঘটক	...	নীহার কুণ্ডু ও সরোজ চৌধুরী
নিতাই	...	দেবু গোস্বামী
হরিপদ	...	অজিত চৌধুরী
নটবর	...	শৈলেশ মিত্র
গোবর্ধন	...	অনাথ চট্টোপাধ্যায়
ভুখন্‌সিং	...	বাসুদেব ভট্টাচার্য
বৃন্দাবন	...	জ্ঞান কুণ্ডু
* বালক দর্প	...	নীরেন ভট্টাচার্য
বৈরাগীদা	...	
যুবক	...	
পিয়ারাবাঈ	...	নীলিমা সান্যাল ও মঞ্জুলা সেন
রতনবাঈ	...	মিতা চট্টোপাধ্যায় ও জয়শ্রী সেন
* বালিকা রত্না	...	ঝুমঝুমি বাগচি ও বাবলু সেন

* প্রয়োজন হলে বালক দর্প ও বালিকা রত্নার চরিত্র দুটি বাদ দেওয়া যেতে পারে।

"……একটা দুর্নাম আছে, সৌখীন নাটুকে দলগুলি অভিনয়ের ব্যাপারে স্টেজের ভাড়া, অভিনেত্রীদের পারিশ্রমিক, সাজপোশাক আলো আর মাইকের ভাড়া, সবকিছুই দেন বা দিতে বাধ্য হন ; —কার্পণ্য শুধু নাট্যকারের সম্মান-দক্ষিণায়। আশাকরি এ দুর্নাম চিরস্থায়ী হবে না।……"

—নাট্যপরিষদ্

৭।২।৫৯

স্বর্ণমুখী



প্রস্তাবনা

(আসন্ন সন্ধ্যা। অন্ধকার হয়ে আসছে। পোড়ো জঙ্গল গোছের গাছপালা-ঘেরা জমিটা অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কল্পনা করা যেতে পারে, মঞ্চের বাইরেই একটা দিঘি আছে। একটি যুবক সারা দুপুর সেই নির্জন দিঘির পাড়ে বসেছিল ছিপ নিয়ে;—এখন দিঘির পাড় থেকে উঠে একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে ছিপ থেকে বঁড়শি খুলছে একমনে। এমন সময় কোথা থেকে ভেসে এল কণ্ঠস্বর—)

কণ্ঠস্বর ঃ কি হল ? একটাও মাছ পেলে না ?

যুবক ঃ (বঁড়শী খুলতে খুলতে সেইদিকেই চোখ রেখে) উঁহু, না।

কণ্ঠস্বর ঃ এ-দিঘির পারে কতকাল পরে তুমি এসে ছিপ ফেললে আজ প্রথম। কতকাল পরে তবু সাড়া পেলুম আজ মানুষের।—এবার বাড়ি ফিরবে বুঝি ?

যুবক ঃ (নিজের কাজ করতে করতে) হ্যাঁ।

(বলতে বলতে যুবকটি বঁড়শিটাকে খুলে একটা কৌটোর মধ্যে রাখতে যাচ্ছিল; হাত ফস্কে কৌটোটা পড়ে গেল মাটিতে। ভেতরকার বঁড়শিগুলো ছড়িয়ে গেল সব।

যুবক তাড়াতাড়ি ঘাসের ওপর থেকে একটি একটি করে বঁড়শি তুলতে লাগল খুঁটে খুঁটে।)

কণ্ঠস্বর : হ্যাঁ, তোলো। খুঁজে খুঁজে তোলো, খুঁটে খুঁটে তোলো, একটি-একটি করে তোলো। যা ছড়িয়ে গেল, তাকে কুড়িয়ে নাও। যা হারিয়ে গেল, তাকে খুঁজে বের করো।

(এতক্ষণে যুবকটি বড়শি তুলতে তুলতে কণ্ঠস্বর আন্দাজ করে কণ্ঠস্বরের অধিকারীকে দেখবার জন্যে মুখ ফেরাল। কিন্তু কোথাও নেই কেউ। শুধু সন্ধ্যার আলো যেন আরো অস্পষ্ট হয়ে আসতে লাগল। যুবক একটুক্ষণ অবাক-বিস্ময়ে চারিদিকে তাকিয়ে জিনিসপত্র ঝোলা-ব্যাগের মধ্যে গুছিয়ে তোলায় মন দিলে।)

কণ্ঠস্বর : দেখতে পাচ্ছ না আমাকে ? আমিও ছড়িয়ে রয়েছি এই মাঠের মাঝে, ঐ ভাঙা থামের খাঁজে খাঁজে, ঐ মজা দিঘির পাড়ে ;—ঠিক তোমার ঐ বঁড়শিগুলোর মতন। ঐ যে চারিদিকে ভাঙা ইটের টুকরো রয়েছে ছড়িয়ে,—ঐগুলোকেও কুড়িয়ে কুড়িয়ে জড়ো করতে পারো ? পারো না,—না ? কেউ পারে না। কেউ চেষ্টা করে না। কিন্তু যদি পারতে, তাহলে দেখতে পেতে আমাকে। দেখতে পেতে, একদিন কী আনন্দে প্রহরে প্রহরে ঘণ্টা বাজাতুম আমি ঢং ঢং করে।—লোহার শিকলে বাঁধা অষ্টধাতুর বিরাট ঘণ্টা।

(ততক্ষণে জিনিসপত্র গুছিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে যুবকটি।)

কণ্ঠস্বর : চলে যাচ্ছ ? কিন্তু এখনো তো একেবারে মিলিয়ে যায় নি আকাশের আলো। টর্চও তো আছে তোমার

কাছে। একদিন আর একটুক্ষণ এখানে বসলেই নাহয়; একটু শুনলেই নাহয় আমার কথা।

(যুবকটি বসল। একটা সিগারেট ধরাল। তারপর এমন একটা আরামের ভঙ্গিতে বসল, যার অর্থ হল.—'বলো, কী তোমার বক্তব্য।'—মঞ্চ ধীরে ধীরে অস্পষ্টতর হতে হতে প্রায় অন্ধকার হয়ে এল। যুবকটিকে ক্রমে আর দেখা গেল না ভাল করে। শুধু কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে লাগল।)

কণ্ঠস্বর ঃ ভুবনপুরের রায়বংশের প্রথমপুরুষ দেবেন্দ্রনারায়ণ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে রাজা খেতাব পেয়ে গড়েছিলেন দুটি প্রাসাদ ;—খাসমহল আর বাঈমহল। আর গড়েছিলেন সদর-সড়কের চৌমাথায় রায়েদের আভিজাত্যের প্রতীক বিরাট এক ঘণ্টাফটক।

হ্যাঁ,—ঘণ্টাফটকই ছিল আমার নাম। প্রহরে প্রহরে ঘণ্টা বাজাতুম কি না।

ঘণ্টাফটকের তলা দিয়ে সেদিন যে চওড়া রাস্তাটা সোজা উত্তরমুখো এগিয়ে হঠাৎ দু-দিকে ভাগ হয়ে বেঁকে গিয়েছিল,—তারই এক ভাগের প্রান্তে ছিল খাসমহল, অন্যপ্রান্তে বাঈমহল। একটি ছিল রায়েদের সংসার, আরেকটি তাঁদের প্রমোদভবন।

খাসমহল আর বাঈমহল,—পুরুষানুক্রমে এই দুই মহল সমান দায়িত্বে চালিয়ে গেলেন রায়েরা। খাসমহলের ঠাকুরবাড়ির উঠোনে দুর্গোৎসবের আয়োজনে যেমন ছিল তাঁদের উৎসাহ,—বাঈমহলের নাচঘরে জলসার আসরেও তেমনি ছিল তাঁদের স্ফূর্তি।

আমার ঘণ্টায় যখন ঢং ঢং করে সন্ধ্যা সাতটার ঘণ্টা বাজত, খাসমহলের ঘোড়া তার রাজাকে পিঠে নিয়ে পৌঁছে দিত বাঈমহলের নাচঘরে। তিন ঘণ্টার জন্যে সেখানে বেজে উঠত সারেঙ্গি, নেচে উঠত নূপুর, দুলে উঠত মন। তারপর আমি রাত দশটার ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেই ঘোড়া আবার তার রাজাকে ফিরিয়ে এনে দিত খাসমহলের রানীর কাছে।

খাসমহলের রানীরা রায়েদের দিয়েছিলেন সংসার, সেবা। বাঈমহলের মালিকান্‌রা দিয়েছিলেন সুর, ছন্দ। একটি পাখির দুটি ডানার মতো দুটি মহল হয়ে উঠেছিল ভুবনপুরের রায়বাড়ির অপরিহার্য দুই অঙ্গ।

কিন্তু এক মহল তার নূপুর-নিক্বনের উচ্ছলতা আর সারেঙ্গির মাদকতায় ভরে গিয়েও কেবলই টের পেত,—কোথায় যেন সে অপরাধী হয়ে আছে সবার কাছে। আরেক মহল তার সকল সামাজিক গৌরব নিয়েও ভাবত,—বুকের কোন্‌খানটায় যেন অনেকখানি ফাঁক রয়ে গেল!

দুই মহলের বুকের মধ্যেকার সেই চাপা কান্নার কথাটা কেই বা জানতো বলো?

সেদিন পুরুষানুক্রমে খাসমহলের মালিকও যেমন বদলেছে,—বাঈমহলের মালিকান্‌ও বদলেছে তেমনি। বাঈমহলের প্রথম বাঈ মুন্নিবাঈ এসেছিলেন রায়বংশের প্রথম পুরুষ দেবেন্দ্রনারায়ণের আমলে। তিনি সময় থাকতেই জয়পুর থেকে আনিয়েছিলেন তাঁর বোনের মেয়ে

লছমীকে। লছমীর পর কমলাবাঈ। আর কমলাবাঈ-এর পর এসেছিলেন বাঈমহলের চতুর্থা মালিকান্ পিয়ারাবাঈ জয়পুরী।

(যুবক এবার হাতের টর্চটা জ্বেলে উঠে দাঁড়িয়েছে।)

কণ্ঠস্বর: উঠে দাঁড়ালে? চলে যেতে হবে বুঝি এবার? যাবে বৈকি। রাত হল তো। যাবার পথে ঐ ভাঙা থামগুলোর কাছে দাঁড়িয়ে কান পাতবে একটু? যদি পাতো,—হয়তো, হয়তো আজও শুনতে পাবে বাঈমহলের নাচঘর থেকে ভেসে আসছে পিয়ারাবাঈয়ের গানের সুর।

(যুবক নিষ্ক্রান্ত হল। সঙ্গে সঙ্গে ভেসে এল গানের সুর।)

———

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(ভুবনপুরের বাঈমহলের নাচঘর। গান চলছে। গাইছেন পিয়ারাবাঈ। সুন্দরী। অলঙ্কার ভূষিতা। বয়স ৩০।৩২ বছর। ভুবনপুরের খাসমহলের মালিক জমিদার অনন্তনারায়ণ চৌধুরী বসে আছেন একধারে, মখমলের তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে। বয়স ৪০ বছর। হাতে রূপো বাঁধানো আলবোলার প্রকাণ্ড জরিদার নল। শুনছেন গান। সারেঙ্গীদার ও তবল্‌চি গানের সঙ্গে সঙ্গত করে চলেছে। গান থামল এক সময়। সারেঙ্গীদার ও তবল্‌চি বিদায় নিলে। ভৃত্য নিতাই এতক্ষণ প্রকাণ্ড পাখা নিয়ে বাতাস করছিল অনন্তনারায়ণকে; সে এবার পাখা রেখে নিভন্ত গড়গড়া উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। পিয়ারাবাঈ এবার উঠে এসে বসলেন অনন্তনারায়ণের পাশে। তিনি মুক্তোর একটি সাতনরী পরিয়ে দিলেন পিয়ারবাঈ-এর কণ্ঠে। কুর্ণিশ জানিয়ে পিয়ারাবাঈ বললেন—)

পিয়ারা : হঠাৎ আজ এমন ইনাম ?

অনন্ত : (মৃদু হেসে রসিকতার সুরে) মাঝে মাঝে বকশিস্ না দিলে যদি হাতছাড়া হয়ে যাও ?—জানো পিয়ারা, বড়বৌ আজ বেশ ভাল আছে। বুকের যন্ত্রণাটা কাল রাত থেকে একেবারেই নেই।

পিয়ারা : সত্যি ? ভাল আছেন খাসমহলের রাণী ?

অনন্ত : হ্যাঁ। কবিরাজ বলেছে এইভাবে আর কিছুদিন

থাকলে মাসখানেকের মধ্যেই বড়বৌকে হাওয়া বদল করতে নিয়ে যাওয়া যেতে পারবে।

পিয়ারা ঃ রনছোড়জী করুন, তাই যেন হয়। আজ দু'বছর ধরে বড় কষ্ট পাচ্ছেন রাণীজী।

অনন্ত ঃ কতকাল পরে বড়বৌ আজ নিজে হাতে পান সেজে দিলে আমায় শখ করে। আমার হাতের এস্রাজ শুনলে শুয়ে শুয়ে। সারাদিন মনটা আজ আমার হাওয়ায় ভাসছে। সকালে তিনজন প্রজার বাকি খাজনা মাফ করে দিলুম, সহিসটাকে বিলিয়ে দিলুম আমার চেন-ওলা সোনার ঘড়িটা, ন্যায়রত্নের টোলে বড়বৌয়ের নামে দিলুম একটা মোটা টাকার বৃত্তি। তবু যেন মন ভরল না। মাণিকলাল জহুরী এসেছিল নতুন কতকগুলো জড়োয়া গহনা দেখাতে,—মুক্তোর এই সাতনরীখানা তোমার জন্যে তুলে না নিয়ে পারলুম না। জিনিসটা ভাল নয়?

পিয়ারা ঃ চমৎকার।

অনন্ত ঃ এক জোড়া ছিল। এর সেই জোড়াটা আজ নিজে হাতে পরিয়ে দিয়েছি খাসমহলের রাণীর গলায়।

পিয়ারা ঃ মাণিকলাল জহুরীর কাছ থেকে আমিও কিন্তু আজ হার নিয়েছি এক ছড়া।

অনন্ত ঃ তাই নাকি?

পিয়ারা ঃ হ্যাঁ, আমার রত্নার জন্যে।

অনন্ত ঃ রত্না?

পিয়ারা ঃ বাঃ! ভুলে গেলে এরই মধ্যে? সেই যে, দিন-দশেক হল আনিয়েছি জয়পুর থেকে,—আমার মা-বাপ-মরা ভাইঝি ;—দশ বছর বয়েস।

অনন্ত ঃ ওঃ! বুঝতে পেরেছি।—এই বাঈমহলের সেই ভবিষ্যৎ-মালিকানটি?

পিয়ারা ঃ হ্যাঁ। আনিয়ে নিলুম। বাঈমহলের আদব-কায়দাগুলো শিখে নিক এখন থেকে।

অনন্ত ঃ আচ্ছা, তুমি কত বছর বয়সে এসেছিলে যেন পিয়ারা এই ভুবনপুরের বাঈমহলে?—বারো?

পিয়ারা ঃ তের।—দেখতে দেখতে কতদিন হয়ে গেল!

(এই পর্যন্ত বলে পিয়ারাবাঈ নিজের পায়ের পায়জোড় এবং মাথার ঝাপটা ইত্যাদি বাড়তি গহনা খুলে রাখতে লাগলেন মস্ত ট্রের উপর।)

অনন্ত ঃ সত্যি, কতদিন, কতকাল হয়ে গেল! সে কবে ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে রাজা খেতাব পেয়েছিলেন দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়। এই বাঈমহল, ঐ খাসমহল আর এই দুই প্রাসাদের মাঝখানের ঐ বিরাট ঘণ্টাফটক, সবই সেই তাঁর তৈরী। আমরা শুধু ভোগ করে চলেছি। চারপুরুষ ধরে কেবল বাঁধাছকে ভোগ করে চলেছি।……মাঝে মাঝে মনে হয়, বড্ড যেন একঘেয়ে হয়ে চলেছে; একটা বদল দরকার, এলোমেলো উল্টোপাল্টা হওয়া দরকার।

(ভৃত্য নিতাই নতুন করে গড়গড়া সেজে এনে রেখে গেল। অনন্তনারায়ণ নল তুলে নিলেন।)

অনন্ত ঃ আচ্ছা, কমলাবাঈ যখন জয়পুর থেকে নিয়ে এলেন তোমাকে এখানে, কি রকম মনে হয়েছিল তোমার ?

পিয়ারা ঃ (ততক্ষণে বাড়তি গহনা খোলা হয়ে গেছে) কি জানি, এতদিন পরে ঠিক মনে পড়ে না আর সেই ছোটবেলার কথা। শুধু মনে আছে, আমি যেদিন প্রথম এখানে এলুম, তোমার বাবা আমার চিবুকে হাত দিয়ে মুখটা তুলে ধোরে মামীর দিকে চেয়ে বলেছিলেন,—কমলা, তোমার এই পিয়ারার নাকে হীরের একটা নাকছাবি দিও।

অনন্ত ঃ আর, আমার কথা মনে পড়ে না কিছু ?

পিয়ারা ঃ হ্যা। তুমি তখন বুড়ো দিলওয়ার হোসেনের কাছে ঘোড়ায় চড়া শিখতে। সবে তখন গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে তোমার ঠোটে। মাস তিনেক হল বিয়ে করে এনেছ রাণীজীকে। আমাদের এই মহলের সামনে দিয়ে যখন ঘোড়ায় চড়ে যেতে, কমলামামী ওপরের বারান্দা থেকে দেখাতেন আমায়। বলতেন, ঐ দ্যাখ, খাসমহলের ভবিষ্যৎ মালিক। চিনে রাখ ভাল কোরে।

অনন্ত ঃ তুমিও বুঝি তাই তোমার ঐ ছোট্ট ভাইঝিটিকে এনে খাসমহলের ভবিষ্যৎ মালিককে এখন থেকেই চিনিয়ে রাখছ দূর থেকে ?

পিয়ারা ঃ দূর থেকে ! তোমার দর্পনারায়ণের সঙ্গে আমার রত্নার খুব ভাব হয়ে গেছে এরই মধ্যে। দুজনে খুব খেলা করে।

অনন্ত ঃ তাই নাকি।

পিয়ারা ঃ হ্যাঁ। রত্নাটা ভারী দুস্টু। দর্পকে না রাগালে যেন ওর ঘুম হয় না।

অনন্ত ঃ রত্না তোমার ভাইঝি হয় বললে না পিয়ারা ?

পিয়ারা ঃ হ্যাঁ। কেন ?

অনন্ত ঃ পিসির স্বভাবটা তাই হাড়েহাড়েই পেয়েছে।

পিয়ারা ঃ মানে ?

অনন্ত ঃ তোমার ঐ ভাইঝিটি এই বাঈমহলের ভবিষ্যৎ-মালিকান্ হবার যোগ্য বটে পিয়ারা।

পিয়ারা ঃ কিসে বুঝলে ?

অনন্ত ঃ খাসমহলের ভবিষ্যৎ মালিকটিকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবার বিদ্যেটা এখন থেকেই বেশ রপ্ত করে নিচ্ছে।

পিয়ারা ঃ (হেসে) আর দর্প ?

অনন্ত ঃ খাসমহলের ভবিষ্যৎ মালিক শ্রীমান দর্পনারায়ণ ? তার বাপ অধম এই অনন্তনারায়ণের মতই নেহাৎই গোবেচারা, ভালমানুষ।

(দুজনেই হেসে উঠলেন হো-হো করে।)

অনন্ত ঃ ভাল কথা,—বাঈমহলের ১২ই কার্তিকের উৎসবের কি করছ ?

পিয়ারা ঃ ১২ই কার্তিক ? তার তো এখনো অনেক দেরী। এই তো সবে ভাদ্র।

অনন্ত ঃ তাই নাকি ? আমার যেন হঠাৎ মনে হল, আর বেশি দিন নেই হাতে। আজই তো মিশীরজীকে বলে

দিলুম ভাল একজন সারেঙ্গীদার আনাতে পশ্চিম থেকে। উৎসবের সব জোগাড়-যন্ত্র করতে হবে তো। এবারে আমি ভাবছি—

পিয়ারা : কিন্তু তারও আগে,—সামনেই আসছে খাসমহলের দুর্গোৎসব,—

অনন্ত : খাসমহলের কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ করে দিচ্ছ পিয়ারা?

পিয়ারা : না, না, এমনি মনে করিয়ে দিলাম।

অনন্ত : আমি বুঝতে পারি পিয়ারা,—তোমার কেবলই ভয়, —পাছে আমি বাঈমহলের আকর্ষণে খাসমহলের কর্তব্যে অবহেলা করে বসি। তাই তুমি মাঝে মাঝেই সজাগ করে দাও আমাকে।

পিয়ারা : না, না,—আমি এমনি হঠাৎ……

অনন্ত : খাসমহলের কর্তব্যের কথা ভুল আমার হয় না পিয়ারা কোনদিন। মনে থাকে সবই। সামনেই দুর্গোৎসব,—খাসমহলের সবচেয়ে বড় উৎসব। খাসমহলের রাণীর কাছ থেকে যদি বায়না আসতো, কলকাতা থেকে ভাল যাত্রাগানের দল আনানো চাই, কিংবা শ্রীখণ্ডের কবিগান; আমি ছুটে যেতাম পিয়ারা, নিজে গিয়ে আনন্দ করে ডেকে নিয়ে আসতুম তাদের। কিন্তু খাসমহলের রাণী আবদারও করেন না, হুকুমও করেন না যে!

পিয়ারা : ও কথা থাক্। অন্য কথা বল।

অনন্ত : ঘণ্টাফটকের ঘড়িতে সন্ধ্যে সাতটার ঘণ্টা বাজলে আমি আসি তোমার মহলে,—আবার রাত দশটার ঘণ্টা

বাজলেই ফিরে যাই খাসমহলে। আমার পূর্বপুরুষদের রীতি বজায় রেখেছি অক্ষরে অক্ষরে। কোনদিন এতটুকু এদিক ওদিক করিনি। কিন্তু তবু মাঝে মাঝে মনে হয়, —বুঝি এমনি কোরে দু-মহলকেই আমরা হারিয়েছি।— কোন মহলকেই পাইনি ঠিক পুরোপুরি।

পিয়ারা: ওসব আজেবাজে কথা ছেড়ে বলো দিকিনি আগে, —১২ই কার্তিকের উৎসবের জন্যে কি কি ঠিক করেছ?— এবারের মজলিশে কিন্তু বিষ্ণুপুরের বৈরাগী পাখোয়াজীকে আনাতেই হবে। কী? চুপ করে রইলে যে? আনাবে না?

অনন্ত: ভোলাচ্ছ আমাকে?

পিয়ারা: এই গ্যাখো,—সত্যি মনের কথাটা বললাম কি না, —তাই বিশ্বাস হল না। সত্যি বলছি, শ্রীমন্ত বৈরাগীর মৃদঙ্গের সঙ্গে গান করি, এ আমার অনেক দিনের সাধ।

অনন্ত: সত্যি গাইবে পিয়ারা?

(হাত ধরলেন)

পিয়ারা: সত্যি।

(বাইরে থেকে বাঈমহলের ভৃত্য নিতাই ডেকে ওঠে)

নিতাই: (নেপথ্যে) মা, মা, মাগো।

পিয়ারা: কে রে? নিতাই? কি বলছিস রে? যাচ্ছি। (অনন্তনারায়ণের প্রতি) আসছি এখনি।

(পিয়ারা চলে গেলেন। অনন্তনারায়ণ বসে বসে টানতে লাগলেন আলবোলা। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলেন পিয়ারাবাঈ।)

পিয়ারা: শোনো।

অনন্ত ঃ আমি বসে বসে ভাবছিলুম পিয়ারা, এবারের উৎসবে যদি···কি হয়েছে ? তুমি এমন হাঁপাচ্ছ কেন ?

পিয়ারা ঃ তুমি···তুমি একবার ও-মহলে যাও এখনি।··· খাসমহল থেকে খবর এসেছে রাণীজী হঠাৎ কেমন নাকি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এখনি যাওয়া দরকার।

(দাঁড়িয়ে উঠেছেন অনন্তনারায়ণ)

অনন্ত ঃ এ কেন হল ? এ কেন হল ?···আজ যে ও সবচেয়ে ভাল ছিল···আজ যে ও আমায় কতদিনের পরে নিজে হাতে পান সেজে দিল···সাতনরী গলায় দিয়ে হাসিমুখে আয়নায় মুখ দেখলে···এ কি হল ?···এ কেন হল ? এ কেন হল ?···এ কেন হল ?···

(বলতে বলতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন অনন্তনারায়ণ। পিয়ারা ছুটে গিয়ে দাঁড়ালেন জানালায়।)



দ্বিতীয় দৃশ্য

(বাঈমহল সংলগ্ন উদ্যান। বাগানের মাঝখানে একটি চবুতর। তারই উপর বসে আছে বালক দর্প, পিছনের আকাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে। অশৌচাবস্থা তার। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। হরিপদ চাকর বসে আছে বাগানের একধারে উপু হয়ে। আধাবয়সী বৈরাগীদা গান গাইছে একটি, একতাবায় সুর তুলে। করুণ সে গান। খাসমহলের রাণীর মৃত্যুজনিত হাহাকাবটা ফুটে উঠেছে বৈরাগীদার গানে।

গান চলেছে।···হাল্কা পায়ে রুপোর মল বাজিয়ে ঢুকল বালিকা রত্না। ধীরে ধীরে গিয়ে বসল দর্পর পাশে। হাত রাখল পিঠে। দর্প ফিরে তাকাল। চোখে তার জলের ধারা। রত্না তার ছোট্ট আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিলে দর্পর চোখ।

বৈবাগীদাদা তখনও গান গেয়ে চলেছে।)

বৈরাগীর গান

অব মথুরাপুব মাধব গেল।
গোকুল-মাণিক কো হরি নেল॥
ছিল যত মনোরথ সব ভেল বাদ।
পরিহরি গেলা বন্ধু বিনি অপরাধ॥
শূন ভেল মন্দির, শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশদিশ, শূন ভেল সগরী॥
সখিরে, বিধি ভেল বাম।
কৈসে গোঁওয়ায়ব দিবস হাম॥

———

তৃতীয় দৃশ্য

(নাচঘর। একটা কোনো ব্র্যাকেটে বাঁধানো রয়েছে স্বর্গতা রাণী হৈমবতীর পায়ের ছাপ। তাতে মালা। ধূপ জ্বলছে একটা। পিয়ারা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে কি দেখছিলেন, ঢুকলেন অনন্তনারায়ণ। গায়ে মের্জাইয়ের ওপর সাদা চাদর। শান্ত ধীর পদক্ষেপ।)

পিয়ারা : তুমি!—ওদিকের কাজ সব…

অনন্ত : হ্যাঁ, সব চুকে গেল। অন্ন-বাড়ীর উঠোনে এখন কাঙালী-বিদায় হচ্ছে।

পিয়ারা : বস, বস স্থির হয়ে।

অনন্ত : কিছুক্ষণ আগেই শ্রাদ্ধের আসরে বসে আছি ছেলেটাকে পাশে নিয়ে, নায়েব এসে জিজ্ঞেস করলে,—কাঙালীদের নগদ-বিদায় কত করে দেওয়া হবে হুজুর?—অভ্যাসবশে বলে ফেললুম, ওপরে তোমাদের রাণীমার কাছে জিজ্ঞেস করে এস নায়েব। তিনি যেমনটি বলবেন, তেমনটিই দেওয়া হবে।—বড়বৌ নেই, একথাটা যে আজ কতবার ভুল হল পিয়ারা!

পিয়ারা : মুখে দিয়েছ কিছু?

অনন্ত : উঁ?—

(দেওয়ালে-টাঙানো পায়ের ছাপের ছবির দিকে তাকিয়ে)

অনন্ত : বড়বৌয়ের পায়ের ছাপ?

পিয়ারা : হ্যাঁ। টগর-ঝিকে দিয়ে তুলিয়ে আনিয়েছিলুম। রোজ প্রণাম করে বলি,—আশীর্বাদ করো যেন, এ বেশে এমন কোরে নয়,—আসছে জন্মে তোমার দাসী হয়ে জন্মাতে পারি

অনন্ত ঃ আর বড়বৌ কি বলত জান পিয়ারা? বলত,—বাঈমহলের ঐ পিয়ারা হতভাগীকে আসছে জন্মে আমাদের জাতের মেয়ে হয়ে আমার সতীন হয়ে জন্মাতে বোলো। ঝগড়া করব, আবার ভাব করব। এমন দূর-দূর সতীনপনা ভাল লাগে না।

(বলতে বলতে এগিয়ে যান অনন্তনারায়ণ ছবির দিকে তারপর বলেন—)

অনন্ত ঃ দেখেছিলে পিয়ারা তাকে কোনদিন ?

পিয়ারা ঃ হ্যাঁ, একটিবার। একবার কি একটা যোগের সময় ভোর রাত্রে পাইক নিয়ে গঙ্গাস্নানে যাচ্ছিলেন। আমাদের এই মহলের সামনের পথ দিয়ে যাবার সময় কি জানি কি ভেবে পাল্‌কির দরজা সরিয়ে তাকালেন ওপর দিকে। আমি কেন বুঝি দাঁড়িয়েছিলুম বারান্দায়। লজ্জায় সরে গেলুম। ভোর রাতের আবছা আলোয় অস্পষ্ট দেখেছিলুম তার মুখ। সেই একবার। আর দেখিনি। সে মুখ কিন্তু জীবনে ভুলব না।

অনন্ত ঃ আমি কিন্তু আজ সারাদিনে কতবারই চেষ্টা করলুম বড়বৌয়ের মুখটি মনে করবার ;—একবারও পারলুম না। —তার ঘর, তার বিছানা, তার সাড়ির পাড়, তার বসে থাকার ভঙ্গিটুকু,—সব মনে পড়ছে। কিন্তু মুখটুকু কিছুতেই মনে করতে পারছি না। কিছুতেই না।

পিয়ারা ঃ বোসো।

(বসলেন অনন্তনারায়ণ। পিয়ারা হাতপাখায় বাতাস করতে করতে বললেন—)

পিয়ারা ঃ　বড্ড রোগা হয়ে গিয়েছ ক'দিনে।

অনন্ত ঃ　(ম্লান হেসে বললেন,—) পিয়ারা, ভাবনা আমার দর্প টার জন্যে। ওকে দেখবার আর কেউ রইল না।

পিয়ারা ঃ　কথা বলব একটা ?

অনন্ত ঃ　বলো।

পিয়ারা ঃ　কথা দাও, আমার কথা রাখবে ?

অনন্ত ঃ　অসম্ভব না হলে নিশ্চয়ই রাখব পিয়ারা।

পিয়ারা ঃ　তুমি ইচ্ছে করলেই তা সম্ভব হয়।

অনন্ত ঃ　বলো।

পিয়ারা ঃ　দর্পর কি সত্যিই কেউ রইল না ?

অনন্ত ঃ　(পিয়ারার মুখের দিকে তাকিয়ে) কি বলতে চাও ?

পিয়ারা ঃ　আমি কি কেউ নই তোমাদের ?

অনন্ত ঃ　তোমার কথা কিন্তু এখনও বললে না পিয়ারা।

পিয়ারা ঃ　দর্প যদি আজ থেকে···

অনন্ত ঃ　এই বাঈমহলে তোমার কাছে থাকে ?

পিয়ারা ঃ　তা কি হয় না ?

অনন্ত ঃ　কথাটা আমারও একবার মনে হয়েছিল পিয়ারা। দর্পর সম্বন্ধে তাহলে তো নিশ্চিন্ত থাকতে পারতুম।

পিয়ারা ঃ　তবে ?

অনন্ত ঃ　কিন্তু তা হবার নয়।

পিয়ারা ঃ　কেন ?

অনন্ত ঃ　তা কি বুঝতে পার না ?

পিয়ারা ঃ　কিন্তু—

অনন্ত : পৃথিবীতে অনেক কিছুই 'হলে ভালো হয়',—কিন্তু তবু তা হয় না,—তা হয় না পিয়ারা।

পিয়ারা : দাসীরা কি যত্ন করতে পারবে ওর ঠিক মত ?

অনন্ত : নিশ্চয়ই না।

পিয়ারা : তবে ?

অনন্ত : তবু, রায়বংশের ছেলে, খাসমহল ছেড়ে বাঈমহলে তো মানুষ হতে পারে না।

পিয়ারা : কিন্তু ওর যে মা নেই।

অনন্ত : মা নেই,—কিন্তু সমাজ আছে।

পিয়ারা : ওঃ! হ্যাঁ। মাঝে মাঝে বড় ভুল হয়ে যায় যে আমি জয়পুরের বাঈজীর ঘরের মেয়ে।

অনন্ত : (উঠে দাঁড়ালেন) অভাগা, অভাগা ও পিয়ারা,—তোমার স্নেহের স্পর্শ পাবার উপায় নেই ওর। দাসীর হাতে মানুষ হওয়া লেখা আছে ওর ভাগ্যে। নইলে, মাকে তো অনেকেই হারায় ;—একটা মাসী-পিসিও কি থাকতে নেই ওর।

পিয়ারা : আমাকে ও' মাসী বলে ডাকে।

অনন্ত : লুকিয়ে। সে ডাক তোমার এই বাঈমহলের চারটে দেওয়ালেই আটক থাকে পিয়ারা। সমাজের মুখোমুখি হয়ে তার বাইরে বেরুবার সাহস নেই।

পিয়ারা : আমি যদি দাসী হতাম তোমার খাসমহলের ? যদি হতাম ওর ধাইমা ?

অনন্ত : তা তো তুমি নও।

পিয়ারা ঃ　কিন্তু তার চেয়েও কি আপনার নই ?

অনন্ত ঃ　হ্যাঁ। তবু তার চেয়ে দূরের ;—অনেক দূরের।

পিয়ারা ঃ　কিন্তু—

অনন্ত ঃ　এ প্রসঙ্গ এখানেই শেষ কর পিয়ারা। জিজ্ঞেস করে তোমার যা ব্যথা, উত্তর দিতে গিয়ে তার চেয়ে ঢের বেশি ব্যথা আমাকে পেতে হচ্ছে। আজ চলি। ছেলেটার খোঁজে বেরিয়েছিলুম। দেখেছ তাকে ?

পিয়ারা ঃ　নিচের বাগানে আছে। (এগিয়ে গেলেন জানালার কাছে) ঐ যে বসে আছে ওরা দুটিতে। রত্না আর দর্প। নিচের ঐ চবুতরের ধারে। দেখবে এস।

(অনন্তনারায়ণ ধীরপদে দাঁড়ালেন গিয়ে পিয়ারার পাশে)

পিয়ারা ঃ　তোমার দর্পকে আজ খাসমহলের কেউ খাওয়াতে পারেনি কিছু। আমার রত্না ওকে খাইয়েছে।

অনন্ত ঃ　(সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে) কিন্তু তবু দর্পকে খাসমহলেই মানুষ হতে হবে পিয়ারা। যারা আজ ওকে কিছুতেই খাওয়াতে পারেনি, সেই চাকর-দাসীদের কাছেই মানুষ হতে হবে ওকে।

পিয়ারা ঃ　যদি বাছার পেট না ভরে ?

অনন্ত ঃ　না ভরে, বাঈমহলের মেয়ে রত্না তো রইল।

(বলতে বলতে অনন্তনারায়ণ এসে বসলেন আবার। পিয়ারাবাঈ দাঁড়িয়ে রইলেন জানালায়। খুব ধীরে ধীরে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে এল।)

চতুর্থ দৃশ্য

(বাঈমহল সংলগ্ন উদ্যান। প্রায় বছর দশেক কেটে গেছে। তরুণী রত্না বসে আছে সেই চবুতরের পাড়ে। মাঝে মাঝে উঠে পায়চারী করছে, আবার বসছে। কেমন অস্থির। সেই বৈরাগী বুড়ো হয়েছে এতদিনে। দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে তাকিয়ে তাকিয়ে রত্নাকে। ঢুকল ভৃত্য নিতাইচরণ। তারও চুলে পাক ধরেছে।)

নিতাইঃ না গো রত্নাদিদি, দর্পদাদাবাবুকে কোথাও পেলুম না খুঁজে।

রত্নাঃ বয়েই গেল। ভাবে কি সে? এখানে তার পথ চেয়ে বসে থাকা ছাড়া, আর কি কোন কাজ নেই আমার?

বৈরাগীঃ (গুন্‌গুন্ কোরে শুধু-গলায় গান গেয়ে ওঠে)

ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে রে কালিয়া,
কে তোরে কুবুদ্ধি দিল।
কেবা সেধেছিল পীরিতি করিতে
মনে যদি এত ছিল॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্ নিঠুর কানাই,
না জান লাজের লেশ।
ওসে, বিষম কপট, শ্যাম নটবর,
শঠতার নাই শেষ॥

রত্নাঃ না, না, ঠাট্টা নয়, তুমিই বল বৈরাগীদা, আসবার সময়ই যদি তার না হবে, তাহলে কাল সন্ধ্যায় দরকার কি ছিল বলবার যে,—'রত্না তোমার হাতের জয়পুরী খাবার খাব কাল বিকেলে।'—দরকার কি ছিল বলবার,—'রত্না,

খাওয়ার পর দক্ষিণের জলটুঙ্গী ঘরে বসে একটা চৈতি শুনব তোমার গলায়'… ?

বৈরাগী : সত্যি বাপু, মস্ত দোষ আমার দাদাভাইয়ের।—আর তার চেয়েও দোষ ঘণ্টাফটকের ঐ বুড়ো ঘণ্টাটার। বিকেল বেলার সবকটা ঘণ্টা এমন হুড়মুড় করে বাজিয়ে না দিলে কি তার চলছিল না ? (গুণ গুণ করে) 'ও সে শত যুগ মনে হয়। তারে এক তিল না হেরিলে শতযুগ মনে হয়।'

রত্না : ভাল লাগছে না বৈরাগীদা।—তুই এক কাজ কর নিতাইদা, চারুদাসীকে বলে দে দুপুরবেলা যে খাবারগুলো করেছি, ওরা যেন সব নিয়ে যায়।

বৈরাগী : আর একটু দেখলে হত না রত্নাদিদি ? কত আশা করে সারা দুপুর আগুন-তাতে বসে তৈরী করেছ।

রত্না : বয়ে গেছে ! খাসমহলের রাজকুমার কখন দয়া করে এসে একটু খাবার খেয়ে আমায় ধন্য করবেন, সেই আশায় আমি বসে থাকব নাকি ?

(অলক্ষ্যে দর্পর প্রবেশ)

দর্প : বেজায় ক্ষিধে পেয়েছে রত্না।

(রত্না এবার দেখতে পায় দর্পকে। মুখে তার অনুতাপের চিহ্ন নেই এতটুকুও। বেহায়ার মত সে হাসছে। রত্না রেগে মুখ ফিরিয়ে নেয়। নিতাই মুচকি হেসে চলে যায়। বৈরাগী গুণ্ গুণ্ করে গান গেয়ে ওঠে—)

বৈরাগী : (গুণ্ গুণ্ করে)

ছুঁও না ছুঁও না বঁধু ঐখানে থাক।
মুকুর লইয়া চাঁদ মুখখানি দেখ।

(বৈরাগী চলে যায়। দর্প ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে)

দর্প : কই ? খাবার কই ?

রত্না : ফেলে দিয়েছি।

দর্প : সব ?

রত্না : হ্যাঁ, সব।

দর্প : একটুও নেই ?

রত্না : না।

দর্প : তাহলে আর কি হবে। খাওয়া বাতিল। চল, খালি-পেটে শুধু গানটাই শুনি।

রত্না : খাবার ফেলে দিইনি।

দর্প : তাহলে দাও এনে।

রত্না : সেগুলো দাসী-চাকরদের বিলিয়ে দিয়েছি সব।

দর্প : অতি উত্তম কাজ করেছ। কিন্তু রত্না, সকল ভৃত্যের প্রতিই মালিকানের সমান নজর থাকা উচিত।

বত্না : মানে ?

দর্প : বাঈমহলের সকল ভৃত্যই অমৃতের আস্বাদ পেল,—কিন্তু একটি বান্দা বাদ গেল কেন ?

রত্না : কে ?

দর্প : তোমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে সেই বেঅকুফ্।

রত্না : ছিঃ ছিঃ ! লজ্জা করে না এইসব যাচ্ছেতাই কথাগুলো বলতে ? বেহায়া কোথাকার।

দর্প : স্বীকার করলুম। কিন্তু বেহায়ার ক্ষিদে-তেষ্টা পায় না, এমন কথা কোথাও শুনেছ রত্না ?

রত্না ঃ　(হেসে ফেলে) আচ্ছা, তুমি কী বল তো? তোমার কি লজ্জা সরম কিছুই নেই? দোষ করে হাসতেও বাধে না, আবার বান্দা বলে মাথা হেঁট করতেও সময় লাগে না একতিল? এস, ভেতরে এস।

দর্প ঃ　কিন্তু খাবার তো সব বিলিয়ে দিয়েছ।

রত্না ঃ　দিইনি। এসো।

দর্প ঃ　এইখানেই আন না রত্না।

রত্না ঃ　ওঃ, খেতে পেলে শুতে চায়।—আনছি।

দর্প ঃ　আর শোনো।

রত্না ঃ　কী?

দর্প ঃ　সেই সঙ্গে—

রত্না ঃ　পিসিমার হাতের আমলকির আচার তো? বুঝতে পেরেছি। তাও আনছি।

(রত্নার প্রস্থান)

(ফোয়ারার পাড়ে বসে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে হঠাৎ ষ্টেজের বাইরের দিকে তাকিয়ে দর্প চেঁচিয়ে উঠল—)

দর্প ঃ　আরে, ঘটকমশাই না?

(ঢুকলেন বৃদ্ধ ঘটক মশাই। পায়ে খড়ম, হাতে লাল খেরো-বাঁধানো খাতা, বগলে ছাতা। ভদ্রলোক কানে খাটো।)

ঘটক ঃ　আরে, কে? খোকাবাবু যে—

দর্প ঃ　হ্যাঁ। কি খবর?

ঘটক ঃ　এখানে বসে যে বাবা?

দর্প ঃ　এই এমনি।

ঘটক : (কান এগিয়ে এনে) য়্যাঁ ?

দর্প : এমনি, এমনি বসে আছি।

ঘটক : (দর্পের পাশে বসতে বসতে) ওঃ !—কর্তার কাছে এসেছিলুম্।

দর্প : বেশ।

ঘটক : য়্যাঁ ?

দর্প : বে-এ-এ-এ-শ।

ঘটক : না না, বেশিদিন নয়,—খুব শীগ্‌গিরই লাগিয়ে দেব। তোমরা যেমন চারপুরুষ ধরে জমিদারী চালিয়ে আসছ, আমরাও তেমনি পাঁচপুরুষ ধরে ঘটকালী করে আসছি। বেশিদিন মোটেই লাগবে না। আরে, বড়হুজুর বললেন তো সবে সাতদিন আগে। তিন-তিনটে মেয়ে হাতছাড়া হয়ে গেল।

দর্প : (কৃত্রিম আক্ষেপের সুরে) যাঃ !

ঘটক : আরে না, না,—আরও তিন হাজার পাত্রী এখনও আছে আমার এই খাতায়। ভয় কি ?

দর্প : আছে না কি ?

ঘটক : নিশ্চয়ই।

দর্প : তা আমার জন্যে এবার কোনটি হাতছাড়া করছেন ?

ঘটক : তোমার জন্যে ?

দর্প : হ্যাঁ।

ঘটক : কামারহাটির চক্কোত্তিদের মেয়েটি তো আর চলবে না।

দর্প : কেন ? কেন ?

ঘটক : তার নাসাগ্রে একটি তিল আছে। নইলে সে যাকে বলে একেবারে উর্বশী।

দর্প : আহা! ঐ তিল থাকায় উর্বশী থেকে একেবারে ধপাস্ করে নেমে তিলোত্তমা হয়ে গেল ?

ঘটক : য়্যাঁ ?—হ্যাঁ। আর বল কেন ?—তারপর ধর গিয়ে ভুষণার কেষ্ট গাঙ্গুলীর মেজ মেয়ে,—সেও চলবে না।

দর্প : কেন ? তার কি কর্ণাগ্রে তিল আছে ?

ঘটক : য়্যাঁ ?

দর্প : বলছি, তার আবার খুঁৎটা কোথায় ? চোখ কাণা ?

ঘটক : আরে রামচন্দ্র !

দর্প : ঠ্যাং খোঁড়া ?

ঘটক : কী যে বল।

দর্প : তোৎলা ?

ঘটক : ছি-ছি-ছি,—একেবারে মধুকণ্টকী যাকে বলে ?

দর্প : মধুকণ্টকী ?

ঘটক : হ্যাঁ,—কণ্ঠে মধু যেন কে ঢেলে দিয়েছে,—এমনি মিষ্টি গলার আওয়াজ।

দর্প : (হেসে উঠে) ও, মধুকণ্ঠী।

ঘটক : ঐ-ঐ হল।

দর্প : তবে আর খুঁৎটা কোথায় ঘটকমশাই ?

ঘটক : বড্ড খুঁৎ।

দর্প : বংশের কিছু .....?

ঘটক : কি বললে ?

দর্প : বলছি, বংশের কিছু……?

ঘটক : ভূষণার গাঙ্গুলীদের মতন সদ্বংশ একটা বার করুক দিকি কোনো শালা ;—এক অবশ্য তোমাদের ছাড়া।

দর্প : তবে আপনার ঐ খুঁৎটা কিসের ?

ঘটক : খুঁৎ ?—আর বোলো না।—গেল জ্যৈষ্ঠে তার বিয়ে হয়ে গেছে।

দর্প : (হো হো করে হেসে ওঠে)

ঘটক : হেসো না। ঐ বিয়েটা যদি না হত, তাহলে এই রায়বাড়িতে ও মেয়ের বিয়ে আটকাক তো দেখি কার বাপের সাধ্যি। ঐ এক খুঁতেই তো সব গেল। তা ভেব না বাবাজী। আর একটি মেয়ে আমার হাতে আছে।

দর্প : নিখুঁত ?

ঘটক : একেবারে।

দর্প : (কৃত্রিম আগ্রহে) কি রকম ? কি রকম ?

ঘটক : সে মেয়ে হাসলে ঝরে মাণিক, কাঁদলে পড়ে মুক্তো।

দর্প : আর হাঁচলে ঝরে সর্দি, কাশলে খায় সুক্তো।

ঘটক : (ঠিক শুনতে না পেয়ে) হুঁ।—তুমি তো সব জান দেখছি বাবাজী। দেখেছ নাকি মেয়েকে ?

দর্প : উঁহু।

ঘটক : তবে ?

দর্প : কল্পনা,—ঘটক মশাই,—কল্পনায় দেখেছি।

ঘটক : য়্যাঁ ?

দর্প : বলছি, মেয়ের বাড়ি কোথায় ?

ঘটক : শিবগঞ্জে। মুখুজ্যেদের বড় তরফের মেয়ে। বাপের একমাত্র সন্তান। বিরাট জমিদারী। হুজুরের সঙ্গে এই মাত্র কথা কয়েই তো ফিরছি। নায়েবমশাই বুধবারে মেয়ে দেখতে যাবেন।

দর্প : তাই নাকি ?

ঘটক : হ্যাঁ।—শুনে কেমন লাগছে বাবাজী ? আনন্দ হচ্ছে ?

দর্প : ~~বেজায়~~

ঘটক : তাহলে বলি বাবাজী,—আমার যখন প্রথমবারের বিয়ের সম্বন্ধটা আসে—

দর্প : আপনার কটি বিয়ে ঘটক মশাই ?

ঘটক : সাতটি।—শোনই না আগে ব্যাপারটা।—প্রথমবারের বিয়ের সম্বন্ধটা যখন আসে, তখন বলব কি, আনন্দে আমাদের সাতকড়িকে আমার ড্যাংগুলির কাঠি-গুলি সব দানই করে ফেললুম।

দর্প : তখন আপনার বয়েস ?

ঘটক : এগারো।—তোমার মত বয়েসে ঘরে আমার চতুর্থপক্ষ আলো করে এসেছেন।

(ইতিমধ্যে রত্না রেকাবি হাতে করে ঢুকেই আবার আড়ালে চলে গেছে। ঘটকমশাই তাকে দেখতে না পেলেও দর্প দেখতে পেয়েছে। সে তাড়াতাড়ি বললে—)

দর্প : কিন্তু এদিকে যে ঘরে আপনার সপ্তমপক্ষটি অপেক্ষা করছেন ! সন্ধ্যে হয়ে গেল যে, সেটা খেয়াল আছে ?

ঘটক : য়্যাঁ ?—ঠিক বলেছ বাবা,—একেবারেই হুঁশ ছিল না কথায় কথায়। এটি আবার বড্ড বদরাগী।

দর্প : হবেই ত।

ঘটক : য়্যাঁ ?

দর্প : বলছি, তাড়াতাড়ি বাড়ি যান।

ঘটক : যা বলেছ।

(খুব ব্যস্তভাবে ঘটকমশাইয়ের প্রস্থান। আচারের রেকাবি হাতে রত্নার প্রবেশ।)

রত্না : খাবার চারুদাসী সাজিয়ে আনছে ;—ততক্ষণ এই নাও।

দর্প : কী ?

রত্না : আচার।

দর্প : আর আচার। আচারের চেয়েও মধুরতর জিনিসে পেট একেবারে ভরপূর হয়ে গেল এইমাত্র।

রত্না : কি ?

দর্প : সমাচার।

রত্না : কিসের ?

দর্প : তার পটল-চেরা চোখ, দুধে-আলতায় রঙ, মেঘের মতন চুল। সে হাসলে ঝরে পান্না, কাঁদলে পড়ে মুক্তো, আর হাঁটলে ফোটে পদ্ম। বাপের একমাত্র মেয়ে। শিবগঞ্জে বিরাট জমিদারী। আমার সঙ্গে কুষ্ঠীর মিল একেবারে রাজযোটক।

রত্না : রঙ্গ ভাল লাগছে না কিন্তু।

দর্প : সত্যি।—ঐ যিনি এইমাত্র কথা বলছিলেন, উনিই তো আমাদের ঘটকমশাই।—ভাল ভাল সম্বন্ধ আসছে আমার।

রত্না : ভালই ত।

দর্প : এই অগ্রাণেই বোধ হয় লাগবে।

রত্না ঃ　বেশ ত।

দর্প ঃ　নায়েবমশাই বোধ হয় বুধবার মেয়ে দেখতে যাচ্ছেন শিবগঞ্জে।

রত্না ঃ　ও।

দর্প ঃ　বাবা বলেছেন, নায়েব আগে দেখে আসুক, তারপর একদিন গিয়ে আশীর্বাদ করে আসা যাবে।

রত্না ঃ　বেশ ত।

দর্প ঃ　'বেশ ত', 'ভালই ত' আর 'ও' ছাড়া মুখ দিয়ে তো আর বাক্যি বেরুচ্ছে না রতনবাঈয়ের!

রত্না ঃ　ছাই।

দর্প ঃ　ছাই?—শুনতে তোমার খুব ভাল লাগছে?

রত্না ঃ　খু—উ—ব।

দর্প ঃ　সেটি আর বলতে হয়-না।

রত্না ঃ　কেন?　ভাল না লাগবার কি আছে?

দর্প ঃ　জান কি না যে, আমি বিয়ে করব না।

রত্না ঃ　বিয়ে করবে না?　ভারী যে বীরদর্প!

দর্প ঃ　বীরদর্প হবে না?　আমার নাম যে দর্পনারায়ণ।

রত্না ঃ　হুঁ, শেষে কিন্তু একটি 'নারায়ণ' আছে।　সেই নারায়ণ সাক্ষী করে একদিন একটি মেয়ের ভার তোমাকে তাই নিতেই হবে দর্প।

দর্প।　সে তো আমি নিয়েছি রত্না।—অনেকদিন [illegible]

রত্না ঃ　কবে? কাকে?　(দর্প সামনাসামনি দাঁড়িয়ে হাত ধরে রত্নার)

দর্প ঃ　তোমাকে।　　　(দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকায়।)

পঞ্চম দৃশ্য

(রক্ষিত মহাজনের আমবাগানের পুকুরঘাট। পুকুর আড়ালে আছে। শুধু ঘাটের সিঁড়ির মুখের চাতাল এবং শান-বাঁধানো রোয়াক দেখা যাচ্ছে। তারই ওপর থেবড়ি খেয়ে বসে হুঁকো টানছে রক্ষিত মহাজন। বয়স হয়েছে। হাঁপানী আছে। কথার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝেই দম টেনে নিয়ে খুক্ খুক্ কোরে কাশতে হয়। সুদের কারবারী। পুকুরে জাল ফেলাতে এসেছে সকালে। পাশে আছে হিসাব রক্ষক নটবর। সে একটু তফাতে বসে ঢুলে যাচ্ছে নাগাড়ে। বয়েস হয়েছে তারও। একধারে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে চাষী খাতক গোবর্ধন। ও-পাশে পঞ্চানন নামক অপর এক চাষী খাতক বসে আছে চুপচাপ। তার বয়স হলেও শরীরের বাঁধন শক্ত।)

রক্ষিত : (পুকুরের দিকে তাকিয়ে অদৃশ্য জেলের প্রতি হাঁক পাড়ে) বলি ও পাঁচু, জালটা এবার ফ্যালো। সকাল থেকে শুধু পুকুরপাড়ে বসে বসে মুড়িই চিবোচ্ছ। (এবার গোবর্ধনের দিকে ফিরে) এখনো হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে কেন বাবা ?

গোবর্ধন : কত্তা, এবারটা আমায় মাফ্ কর কত্তা। আমার বলদটারে নিও না,—ওটা নিলি মরি যাব।

রক্ষিত : হুঁঃ, মরে যাব !—(মুখ ফেরালেন) বলি ও পাঁচু, —ঐ যে জলে বড় ঘাই দিলে, কাতলা মনে হল না ?

(ভেতর থেকে জবাব এল,—'হ্যাঁ কত্তা'।)

গোবর্ধন : কত্তা, সব ন্যাও,—শুধু ঐ বলদটারে ছাড়ি দাও।

রক্ষিত ঃ কেন? ছাড়তে গেলুম কেন বাবা গোবর্ধন? ধারটা যখন নিয়েছিলি—

গোবর্ধন ঃ ধার আমি নিই নি কত্তা। নিইছিল আমার বাপ, তোমার বাপের কাছেথে। বাপ আমারও নেই, তোমারও নেই।

রক্ষিত ঃ কিন্তু দেনাটা যে, রয়ে গেছে বাবা।

গোবর্ধন ঃ জানি কত্তা,—দেনার মরণ নেই,—যমেও ছুঁতে পারে না তাকে। আমার বাপ সুদ দিয়ে দিয়ে মরেছে, তবু মরে নি।—আমিও মরি যাব একদিন,—তবু—

রক্ষিত ঃ (চেঁচিয়ে) বলি ও পাঁচু,—মুড়ির ধামিটা শুদ্ধু চিবিও না। জালটা এবার একটু ছড়াও।

গোবর্ধন ঃ কত্তা—

রক্ষিত ঃ আঃ!—যাঃ, যাঃ,—বিরক্তি করিস নে। সময় নেই।

(চোখ মুছতে মুছতে গোবর্ধনের প্রস্থান।)

রক্ষিত ঃ (চেঁচিয়ে) ও পাঁচু,—ওপারের দিকে জলে ওটা কি ল্যাজ আছাড় দিল?

(ভেতর থেকে জবাব এল,—'ল্যাজ নয়,—জলে ডাব পড়ল কত্তা'।)

পঞ্চানন ঃ (উঠে এসে দাঁড়িয়েছে ইতিমধ্যে) কত্তা,—

রক্ষিত ঃ উপায় নেই পঞ্চানন, সামনের পূর্ণিমেয় সত্যনারায়ণের পূজা দেবার সাধ হয়েছে বৌমার। তা দুটো সিন্নিবাতাসা যে করব, হাতে পয়সা নেই। তাই বাধ্য হয়েই ডেকে পাঠাতে হল তোকে।

পঞ্চানন : আজ্ঞে কি যে বলেন।—সারা এই গৌরগঞ্জের মানুষজন, মায় গরু-ছাগলটাকে পর্যন্ত সিন্নি-বাতাসা বিলোবার মতন পয়সা আপনার ঐ ধুতির ট্যাকেই গোঁজা থাকে সদাক্ষণ।

রক্ষিত : (তন্দ্রাচ্ছন্ন নটবরের দিকে তাকিয়ে) ওহে নটবর, শুনছ পঞ্চাননের কথা ?—(নটবর আওয়াজ শুনে ধড়মড় করে উঠে চোখ বড় বড় কোরে তাকায়) আমার মুখের ওপর টকাস্ করে বলে দিলে যে, আমি একটা পাঁড় মিথ্যেবাদী। তেমন তেমন মহাজন হত, জুতিয়ে ছিঁড়ে দিত মুখের চামড়া। পারি নে নটবর, পারি নে। মানুষের ওপর হঠাৎ কেমন কড়া হতে পারি নে।

পঞ্চানন : আমি মিথ্যেবাদী বলি নি কত্তা,—আমি শুধু বলেছি,—

রক্ষিত : ওহে নটবর, শুনলে ? (নটবর ইতিমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল,—আবার ধড়মড়িয়ে উঠে চোখ বড় বড় করলে) পাকে প্রকারে পঞ্চানন আমাকে বুঝিয়ে দিলে যে আমি বাংলা কথারও মানে বুঝি না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই কথাই বললে আর কি যে,—'পাঠশালে ত যাওনি সাত-জন্মে। পেটে বোমা মারলেও 'ক' বেরোয় না। পাঁড় মুখ্যু কোথাকার !'—কি হে নটবর, মানেটা এই রকমই দাঁড়াল না ? কি জানি বাপু, আমি আবার মুখ্যুস্থখ্যু মানুষ।

পঞ্চানন : (পায়ে হাত দিয়ে) কত্তা, এই পায়ে পড়ছি তোমার। সত্যি বলছি—

রক্ষিত : থাক থাক, হাত সরা পা থেকে। জুতো মেরে গোরুদান আর করিসনে পঞ্চানন। আমার যা প্রাপ্য শুধু সেই টাকা কটা ফেলে দে, চুকে যাক। আসল চাইছি না, সুদটাই দে।

পঞ্চানন : আর দুটো মাস, দুটো মাস সময় দাও কত্তা। আমার বড় ছেলে হারাণ সহর থেকে লিখেছে, মাসদুই বাদেই সে ঘরে ফিরবে তার রোজগারের টাকা নিয়ে। তখন একেবারে অনেকখানি মিটিয়ে দেব।

রক্ষিত : সকলেই অমন দূরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে,—'মিটিয়ে দেব' ;—কিন্তু শেষ অবধি দেয় কই ?

পঞ্চানন : সকলের কথা জানিনে কত্তা, আমার কথা ত জানি। তুমি কি মনে কর কত্তা, দেনা ফেলে রাখি আমরা সাধ করে ? দশ টাকার দেনা সময়ে শোধ করতে পারি না, সুদের পর সুদ বেড়ে দেনা দাঁড়ায় একশো টাকা। সে কি আমাদের সাধ ? দুমাস বাদে কেন, যদি পারি, তার আগেই চেষ্টা করব সুদ ছাড়া আসলেরও কিছু শোধ করতে। আমার ছোট ব্যাটা গোপ্‌লার নামে শপথ করে বলছি আজ্ঞে।

রক্ষিত : মা ষষ্ঠীর কৃপায় পঞ্চাননের আমার সাত সাতটি ব্যাটা। ও একটা গেলেই বা ওর কি এসে যায় ? কি বল নটবর ?

(নটবর আবার ধড়মড়িয়ে ওঠে এবং এবার আর ঘুমোয় না।)

পঞ্চানন ঃ কি বললে ? কি বললে তুমি কত্তা ? তুমি কি বলতে চাও ব্যাটার নামে দিব্যি খেয়ে আমি মিছে কথা বলছি ? শোন কত্তা,—দু'মাসের মধ্যে সুদে আসলে তোমার অর্ধেক টাকা শোধ দেব। তার জন্যে যদি ভিটে-মাটি বেচে সকলকে নিয়ে পথে দাঁড়াতে হয়, সেও স্বীকার।

রক্ষিত ঃ (হঠাৎ মোলায়েম সুরে) মিছে রাগ করিস বাবা পঞ্চানন। একটু বুদ্ধিসুদ্ধি খেলিয়ে চেষ্টাচরিত্তির করলে টাকা কি আর জোগাড় হয় না ?—হয়, হয়। (নটবরের দিকে তাকিয়ে) পঞ্চাননের বৌমা, মানে ঐ হারাণ ছোঁড়ার বৌটার রূপের বেশ চটক আছে ; কি বল নটবর ?

পঞ্চানন ঃ কি বলতে চাও কত্তা ?

রক্ষিত ঃ না,—এইমাত্র তুই বলছিলি না যে, ভিটেমাটি বেচে সকলকে নিয়ে পথে দাঁড়াবি ? তাই ভাবছিলাম—

পঞ্চানন ঃ কি ভাবছিলেন ?

রক্ষিত ঃ এই, সকলকে নিয়ে পথে না দাঁড়িয়ে—তোর ঐ হারাণের বৌটাকে একা পথে দাঁড় করালেই—

পঞ্চানন ঃ (চিৎকার) রক্ষিতকত্তা !

রক্ষিত ঃ (অত্যন্ত নির্বিকার মোলায়েম কণ্ঠে) দেনা তোর পনেরো দিনেই সুদে আসলে সব শোধ হয়ে যেত পঞ্চানন।

পঞ্চানন ঃ রক্ষিত কত্তা, ফের ওকথা মুখে আনলে তোমার জিভ ছিড়ে ফেলে দেব। হাতে পায়ে আমার রক্ত ফুটছে। কখন্ কি করতে কি করে ফেলব। আমি চললুম এখন।

রক্ষিত ঃ চলে গেলেই ত আর হয় না পঞ্চানন। টাকার কথাটা একটু ভেবে দেখতে হয় যে।

পঞ্চানন ঃ ভেবে দেখেছি। টাকা তুমি পাবে কত্তা। না, না, দু-মাস পরে নয়, পনেরো দিনের মধ্যেই।—অর্ধেক নয়, তোমাকে সুদে-আসলে সব শোধ করে যাব।

রক্ষিত ঃ এই তো, এই তো আমার পঞ্চাননের মত কথা। পঞ্চানন, তার পাঁচমুখ। পাঁচ মুখে আজ যেন খৈ ফুটছে —কি বল নটবর ?

পঞ্চানন ঃ নটবরবাবু, তোমার মনিবকে বোলো যে, পঞ্চানন পাঁচমুখে কথা কইলেও পাঁচ রকম কথা সে বলে না। আমার ছেলের নামে দিব্যি করছি, আজ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে তোমার মনিব সব টাকা বুঝে পাবেন।

রক্ষিত ঃ বাঃ! বাঃ! এই ত মরদের মত কথা!—তোর বাপ-ঠাকুর্দা ছিল ঠ্যাঙাড়ে। তাদের সেই লুঠের সোনাদানার কুঁচো কিছু আছে বুঝি এখনও ঘরে ?

পঞ্চানন ঃ (যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে) আমার বাপ-ঠাকুর্দার লুঠের সোনাদানা, সে তো তোমাদের বাপ-ঠাকুর্দার সিন্দুকেই তোলা আছে কত্তা। এক ভরি সোনায় আমার বাপ-ঠাকুর্দা পেয়েছে আট গণ্ডা পয়সা, আর তোমার বাপ-ঠাকুর্দা পেয়েছে উনিশ টাকা! ভুলে যাচ্ছ কেন ?

(পঞ্চাননের প্রস্থান।)

রক্ষিত ঃ (চেঁচিয়ে) পঞ্চানন! (পরমুহূর্তেই ঠাণ্ডা হয়ে যায়

কণ্ঠ) নটবর, পঞ্চানন আমাদের কথাগুলো বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে বলে। কি বলো? (হুঁকো টানলেন। ধোঁয়া এল না। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন।) হতভাগার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আধলা পয়সার তামাকই পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আর এক ছিলিম তামাক সেজে আন ত নটবর।

(হুঁকো নিয়ে নটবরের প্রস্থান। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে নেপালের প্রবেশ। রক্ষিত মহাজনের উপযুক্ত পুত্র নেপাল। ছোকরা বয়স। উড়তে সুরু করেছে।)

নেপাল : বাবা? পেঁচোকে দিয়ে তুমি নাকি আজ জাল ফেলাচ্ছ পুকুরে?

রক্ষিত : হ্যাঁ। কেন?

নেপাল : (পুকুরঘাটের দিকে এগিয়ে গিয়ে চেঁচায়) পাঁচু, সবচেয়ে বড় মাছটা আমার জন্যে রাখবি।

রক্ষিত : তোর আবার আলাদা মাছ কি হবে?

নেপাল : আছে বাবা, আছে।—সব খোঁজে তোমার দরকার কি?

রক্ষিত : কথা তোর অমন জড়িয়ে যাচ্ছে কেন রে? সাত সকালে মদ গিলেছিস?

নেপাল : না।

রক্ষিত : না?—যা-যা, আগে তেল মেখে চান করে দুটো পান-সুপুরি মুখে দিয়ে আয়, তারপর বাপের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলিস।

নেপাল : কথা আমি মোটেই বলতে চাইনি।—মার কাছে

শুনলুম তুমি মাছ ধরাতে বাগানে এসেছ,—তাই পাঁচুকে মাছের কথাটা বলেই চলে যাচ্ছিলুম।—তুমিই ত কথা বাড়ালে।

রক্ষিত: মদের পয়সা পেলি কোত্থেকে? তোর মা মাগী দিয়েছে ত? হারামজাদী মারধোর খায়নি কি না অনেক দিন। তবু দাঁড়িয়ে রইলি? যা বেরো আগে, বেরো, বেরোলি?

নেপাল: ধ্যাৎ! দিনরাত শুধু খিট্‌খিট্!—পাঁচু, বড় মাছটা আমার জন্য রাখিস্।

(নেপালের প্রস্থান)

রক্ষিত: সব ওড়াবে, সব ওড়াবে হতভাগা। চক্ষু বুঁজলেই সব ফক্কা করবে।

(বাইরে থেকে ডাক্ দিতে দিতে ভুবনপুরের বাবুবাড়ির সরকার গঙ্গাপ্রসাদের প্রবেশ।)

গঙ্গাপ্রসাদ: রক্ষিতমশাই আছেন না কি?

রক্ষিত: আরে আসুন, আসুন, আসুন,—গঙ্গাপ্রসাদবাবু আসুন।

গঙ্গাপ্রসাদ: বাড়িতে গেছলুম, শুনলুম বাগানে এসেছেন মাছ ধরাতে।

রক্ষিত: হ্যাঁ-হ্যাঁ।—ঐ দুটো পুঁটি বাটা আর কি। মাছ কি আর আছে পুকুরে?

(নটবর হুঁকো এনে দিল রক্ষিতের হাতে)

গঙ্গাপ্রসাদ: বলছিলুম কি—

রক্ষিত ঃ আরে, বসুন বসুন, জিরোন আগে। ভুবনপুরের রায়বাড়ির সরকারমশাই আপনি। আমাদের রাজবাড়ির লোক। খাতিরের মানুষ। তামাক টামাক খান। (হুঁকো এগিয়ে দিয়ে) কিসে এলেন ?

গঙ্গাপ্রসাদ ঃ পাল্‌কিতে।

রক্ষিত ঃ পাল্‌কিতে—ওঃ, তাহলে নটবর, দৌড়ে একবার বাড়িতে গিয়ে খবর দাও যে, এখানে পাল্‌কি-বেহারাদের জন্যে যেন জল-বাতাসা পাঠিয়ে দেয়। (গঙ্গাপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে) চারজনই ত ?

(তৎক্ষণে নটবর চলে গেছে)

গঙ্গাপ্রসাদ ঃ না, ছ'জন। কিন্তু ওসব আবার—

রক্ষিত ঃ (চেঁচিয়ে) বোলো ছ'জন আছে,—ছ'খানা বাতাসা দিতে।—(গলা নামিয়ে) আপনাকে কি দেব ? ডাব ?

গঙ্গাপ্রসাদ ঃ না, কিছু না। তেষ্টা-টেষ্টা কিছুই পায়নি। বড়-হুজুরের চিঠিটা ঠিক সময়ে পেয়েছিলেন ত ?

রক্ষিত ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, সে সব আমি ঠিক করে রেখেছি। এবারের সুদটা কিন্তু একটু চড়বে যে। বড্ড টানাটানি। দলিল-টলিল সবই তাক্‌-তৈরী আছে। পাটা এনেছেন নাকি সঙ্গে ?

গঙ্গাপ্রসাদ ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ,—গৌরহাটী আর পদ্মতলা মহালের···

(পকেট থেকে পাটা বের করতে যান)

রক্ষিত ঃ থাক্ থাক্, তাড়া কিসের ? গরীবের বাড়ীতে পায়ের ধুলো যখন দিয়েছেন, এখনি ত আর যেতে দিচ্ছিনে।—তা এবারে যে অনন্ত রায় একসঙ্গে এতগুলো

টাকা চেয়ে বসলেন ? ব্যাপার কি ? ছেলের বিয়েতে ধূমধাম বুঝি খুব জমজমাট্ করে হচ্ছে ?

গঙ্গাপ্রসাদ ঃ আজ্ঞে তা একটু—একমাত্র ছেলে তো।

রক্ষিত ঃ আহা, হবে না ? বলে, ভুবনপুরের রায় ! বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খেত যাদের দাপটে ! বাবার মুখে শুনেছি, ওঁদের বাঈমহলের এক রাতের জলসার খরচই ছিল নাকি পাঁচ হাজার টাকা ! তা' সেই রায়বংশের একমাত্র বংশধরের বিয়ে ;—ধূমধাম হবে না ? তা' সম্বন্ধটা শুনলুম, শিবগঞ্জের বেণী মুখুজ্যের মেয়ের সঙ্গে চলছে ?

গঙ্গাপ্রসাদ ঃ আজ্ঞে।

রক্ষিত ঃ তাহলে তো মোটা কিছু আসছে রায়দের সিন্দুকে ; কি বলেন সরকার মশাই ?

গঙ্গাপ্রসাদ ঃ আজ্ঞে, আমরা সামান্য কর্মচারী। ওসব—

রক্ষিত ঃ ঠিক কথা, ঠিক কথা। আমরা আদার ব্যাপারী, ওসব জাহাজের খবরে আমাদের দরকার কি বলুন না। —(চেঁচিয়ে) বলি ও পাঁচু,—তোমার ঐ লোকটিকে বল দিকিন,—ঐ যে খানিক আগে একটা ডাব পড়ল পুকুরে, —ওটা তুলে মুখ-টুখ ছুলে আনতে (গঙ্গাপ্রসাদের দিকে ফিরে) একটা ডাব খান ততক্ষণ।

(গঙ্গাপ্রসাদ যত 'না না' করেন, রক্ষিত ততই বলে,— 'একটা ডাব, একটা ডাব শুধু।')

ষষ্ঠ দৃশ্য

[বাঈমহল সংলগ্ন পূর্ববর্ণিত উদ্যান। অপরাহ্ণ। বন্দুক কাঁধে নিয়ে পায়চারী করছে দর্প। রত্না প্রবেশ করল।]

রত্না : কি ব্যাপার? রণবেশে এমন অসময়ে?

দর্প : তোমার কাছে আসব, তারও আবার সময়-অসময় আছে নাকি?

রত্না : আছে বৈকি। খাসমহলের কর্তারা আজ চারপুরুষ ধরে এই বাঈমহলে এসেছেন ঘণ্টাফটকে সন্ধ্যে সাতটার ঘণ্টা বাজবার পর; তার আগে নয়।

দর্প : আমি তো আর খাসমহলের কর্তা নই। আর তুমিও কিছু বাঈমহলের বাঈ হয়ে ওঠনি এখনও।

রত্না : মেজাজ তিরিক্ষে কেন? একটাও পাখি পাওনি বুঝি?

দর্প : না।

রত্না : সে আমি আগেই বুঝতে পেরেছি তোমার কথাবার্তার ধরণ দেখে। তা হঠাৎ আমায় ~~তলব কেন~~?

দর্প : বলছি। কিন্তু তার আগে শোন;—একদিন তো বাঈমহলের বাঈ হবে তুমি, আমিও হব খাসমহলের কর্তা;—তুমি কি বলতে চাও, সেদিন সন্ধ্যে সাতটার আগে দেখা হবে না তোমাতে আমাতে?

রত্না : সে ভাবনা এখন থেকে কেন? তার অনেক দেরী আছে।

দর্প : তবু বল।

রত্না : এতকাল তাই তো হয়ে এসেছে। তাই তো নিয়ম এখানকার।

দর্প : বিশেষ কোন কারণেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে না?

রত্না : বিশেষ কারণ ঘটলে অবিশ্যি—

দর্প : আমার যদি বিশেষ কারণ রোজ ঘটে?

রত্না : (হেসে) তাই ঘটিও।—বদ্ধ পাগল! যাক, আমায় তলব কেন?

দর্প : আজ আমি একটাও পাখি শিকার করতে পারিনি।

রত্না : সে তো শুনেছি।

দর্প : কিন্তু কেন জান?

রত্না : (কৌতুক করে) পাখির দিকে বন্দুক উঁচিয়ে মনে হল, ও তো পাখি নয়, ও যে বাঈমহলের রতন! অমনি তোমার হাত গেল কেঁপে, টিপ্ গেল ফস্কে……

দর্প : ঠাট্টা কোর না রতন, মেজাজ ঠিক নেই।

রত্না : কেন?

দর্প : বন্দুক নিয়ে দক্ষিণের জলার কাছে সবে পৌঁছেছি, হরি সিং দারোয়ান গিয়ে হাজির। বললে, বাবু ডেকে পাঠিয়েছেন, জরুরী দরকার।

রত্না : তারপর?

দর্প : রেকাব খুলে ঘোড়াটাকে দিয়েছিলুম ছেড়ে, আবার জীন চাপিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বাড়ি ফিরি তখুনি।

রত্না : কেন ডেকেছিলেন ?

দর্প : আর কেন! বাড়ি ফিরে দেখি একজন ভদ্রলোক গল্প করছেন বাবার সঙ্গে নিচের হলঘরে। আমি ঢুকতেই বাবা বললেন, 'প্রণাম কর খোকা।'—কে বুঝতে পারছ ?

রত্না : উঁহু, আমি গণৎকার নই।

দর্প : শিবগঞ্জের সেই পরমাসুন্দরী মেয়ের বাপ স্বয়ং। এসেছেন পাত্রটীকে অর্থাৎ আমাকে স্বচক্ষে দেখতে।

রত্না : ভাবী শ্বশুরের চেহারা কেমন ?

দর্প : কী হবে জেনে ?

রত্না : সেটা শুনতে পেলে সেই পরমাসুন্দরীর রূপের খানিকটা আন্দাজ করবার চেষ্টা করতাম।—যাক, সানাই বাজছে তাহলে এবার খাসমহলে। আমায় কি দেবে বল ?

দর্প : কি বকছ তুমি ?

রত্না : বাঃ রে, ভুবনপুরের ছোট-হুজুরের বিয়ে, বকশিস পাব না ?

দর্প : আচ্ছা, চিরকালই কি তুমি সব জিনিষ এমনি করে হেসে হাল্কা করে দেবে ?

রত্না : আশীর্বাদ কর, তাই যেন পারি। যেন আমার কলঙ্কে তোমাকে কলঙ্কিত না করি কোনদিন।

দর্প : রতন, তোমাতে আমাতে যদি পালিয়ে যাই কোথাও ?

সেখানে কে জানবে তুমি বাঈমহলের মেয়ে ; কে জানবে, আমি খাসমহলের ছেলে ?

রত্না ঃ কেউ না জানুক, তুমি তো জান, আমি তো জানি।

দর্প ঃ কী ?

রত্না ঃ তুমি কে, আমি f ।—দর্প, আমাদের এই পরিচয়ই ভাল, ঘণ্টাফটকে সা । বাজবার পরেই না হয় হবে আমাদের দেখ

দর্প ঃ কিন্তু রতন—

রত্না ঃ তোমার বাবার কথা ভেবে দেখেছ ? বৌয়ের মুখ দেখবেন, নাতির মুখ দেখবেন, এই বয়সে এই তো তাঁর একমাত্র সাধ।

দর্প ঃ রত্না, রিত্না, রত্না, তুমি কেন ঐ শিবগঞ্জের বড়-তরফের একমাত্র মেয়ে হয়ে জন্মালে না,—যার সঙ্গে আমার কুষ্ঠার মিল রাজযোটক ? বেশ হত, নায়েব মশাই তোমাকেই যেতেন দেখতে,—বাবা হাঙরমুখো কঙ্কন দিয়ে তোমাকেই করে আসতেন আশীর্বাদ,—তারপর একদিন আলো জ্বেলে বাজনা বাজিয়ে বরকন্দাজ নিয়ে যেতাম তোমাকে বিয়ে করতে।

রত্না ঃ দর্প, সন্ধ্যে হয়ে গেছে, আমি যাই।

দর্প ঃ কিন্তু রত্না, বিয়ে করলে, শিবগঞ্জের সেই মেয়েটির প্রতি সুবিচার করা হবে কি ?

রত্না ঃ তোমার পূর্বপুরুষরা সবাই তো দু-মহলের প্রতিই সুবিচার করে এসেছেন।

দর্প ঃ পূর্বপুরুষদের কথা জানি না,—খাসমহল আর বাঈমহল, —দু'মহলের টানাপোড়েন তাঁদের সইলেও আমার সইবে না রত্না। আমি পারব না।

রত্না ঃ তবে নাহয় একটা মহলই থাকুক তোমার জীবনে।

দর্প ঃ (সোৎসাহে) আমিও তো তাই বলছি রত্না, আমার জন্যে থাকুক শুধু—

রত্না ঃ খাসমহল।—বাদ যদি একান্তই দিতে হয়, বাঈমহলকে বাদ দেওয়াই উচিত দর্প। (প্রস্থানোদ্যত)

দর্প ঃ রতন! (রত্না থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে) থাক্ রত্না। জয়পুরের মেয়ে তুমি, মরুভূমির মেয়ে; মনে তোমার এক ফোঁটা জল নেই রত্না, এক ফোঁটা জল নেই।

(প্রস্থান)

(দর্পর গমনপথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে রত্না। বেশ কিছুক্ষণ পর পিছন থেকে পিয়ারাবাঈ ধীরে ধীরে এসে তার পিঠে হাত রাখেন।)

পিয়ারা ঃ রত্না।

রত্না ঃ ওঃ, পিসিমা!—কি বলছ ?

পিয়ারা ঃ এখানে আজ এমন সময় একা দাঁড়িয়ে ? খাঁসাহেব বসে আছেন ঘরে। গান শিখলে না ?

রত্না ঃ শরীরটা ভাল নেই পিসিমা।

পিয়ারা ঃ শরীর ভাল নেই ? না, আর কিছু ? ভাল করে ফিরে দাঁড়া তো আমার দিকে।

(রত্না এবার পিয়ারাকে জড়িয়ে ধোরে তাঁর বুকে অশ্রুসিক্ত মুখ লুকোয়)

পিয়ারা ঃ ছিঃ মা, অমন করতে নেই। এ তুই···এ তুই কী করেছিস বোকা মেয়ে?···এ কি তোর আমার সাজে মা?······ওরে, আমাদের কি অমন করে ভালবাসার অধিকার আছে?—শোন, মুখ তোল। (রত্না মুখ তোলে) দর্পর সামনে এমন করে চোখের জল ফেলিসনি যেন কোনদিন। আনমনা উদাসিনী হয়ে দাঁড়াস নি যেন কখনো। যা পাগল ছেলে! বলেই বসবে হয়ত, 'বিয়েই করব না'। তাহলে সে যে বড় দুঃখের কথা হবে;—ভুবনপুরের বড় কলঙ্কের কথা।

রত্না ঃ বলেছিল পিসিমা। কতদিন কতভাবে বলেছে।

পিয়ারা ঃ কী?

রত্না ঃ বিয়ে করবে না।—

পিয়ারা ঃ আর কি বলেছিল?

রত্না ঃ বলেছিল, আমাকে নিয়ে চলে যাবে অনেক দূরে। ঘর বাঁধবে নতুন সমাজে। নতুন পরিচয়ে।

পিয়ারা ঃ (উদ্বেগে) রত্না, ওরে, তুই কি বললি?

রত্না ঃ হেসে বললাম, দূর, তাও কি হয়? আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ঐ ঘণ্টাফটকের ঘণ্টার হিসেবে বাঁধা; তার বেশি নয়।—শুনে সে আমায় বললে, 'পাষাণ'। বললে, আমি মরুভূমির মেয়ে, মনে আমার তাই এক ফোঁটা জল নেই পিসিমা, এক ফোঁটা জল নেই।

(পিয়ারার বুকে রত্না মুখ লুকোয় আবার)

পিয়ারা ঃ রত্না, মা আমার, বুকটা আমার ভরিয়ে দিলি তুই আজ। আর কেউ না জানুক, ওপরের ঐ বিধাতাপুরুষ তো জানলেন, কত বড় ত্যাগ দিয়ে কত বড় আঘাত থেকে বাঁচালি তুই ভুবনপুরের জমিদারকে।—কাউকে আশীর্বাদ করার অধিকারটুকুও আমাদের আছে কিনা জানি না; কিন্তু ওরে, বাঈজীর ঘরে জন্মানো ছাড়া জীবনে যদি আর কোন পাপ কোন অধর্ম না করে থাকি, তাহলে আশীর্বাদ করছি, তুই সুখী হবি রত্না; নিশ্চয়ই সুখী হবি।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[খাসমহলের সদর দালান। গদি মোড়া হেলান-দেওয়া চেয়ারে বসে আছেন প্রৌঢ় অনন্তনারায়ণ। হাতে গড়গড়ার নলটা ধরা। চোখ মুদিত। কি যেন ভাবছেন। একটু তফাতে নিচু ডেস্কে ফর্দ লিখছেন নায়েব। এক সময় চোখ খুলে গড়গড়ায় টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে অনন্তনারায়ণ বললেন,—]

অনন্ত : হ্যাঁ, তারপর নায়েব ?

নায়েব : আজ না হয় থাক হুজুর।

অনন্ত : কেন ?

নায়েব : আপনি বোধ, ~~করি~~ অসুস্থ বোধ করছেন।

অনন্ত : অসুস্থ ?

নায়েব : আজ্ঞে।

অনন্ত : হঠাৎ তোমার একথা কেন মনে হল ?

নায়েব : আজ্ঞে, মাঝে মাঝে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছেন কি না।

অনন্ত : অন্যমনস্ক ? (কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে) নাও, বল এবার। তারপর ? বল, বল,—

নায়েব : আলো বরদার তিন দল।

অনন্ত : উঁ ?

নায়েব : তিনদল আলো ধরেছি।

অনন্ত : ওটা পাঁচ দল কর। তারপর ?

নায়েব : যাত্রাগান দুদিন। যেদিন বৌরাণী আসবেন, আর পাকস্পর্শের দিন।

অনন্ত : ওটা সাতদিন কর। দর্প বৌ নিয়ে আসবার পর থেকে সাত দিন ধরে যাত্রা হবে। হুঁ,—যাত্রাগান হবে কোথায় ?

নায়েব : আজ্ঞে ভিতর-মহলের উঠোনে।

অনন্ত : ওটা কালীমন্দিরের মাঠে কর; গ্রামের সবাই শুনবে। তারপর ?

নায়েব : কলকাতার গোরার বাজনা দু-দল।

অনন্ত : সেই কম্বল ঝোলানো পট্টিবাঁধা ব্যাগপাইপওয়ালা হাইল্যাণ্ডারের দল,—তাও যেন থাকে। তারপর ?

নায়েব : শিবতলার—

অনন্ত : একটা কথা,—বাজনা ক'দল বললে ?

নায়েব : আজ্ঞে দু'দল।

অনন্ত : ওটা তিন দল কর।—আর সেই সঙ্গে আমাদের পবন ঢুলির ঢাক-ঢোলের দলকেও বায়না দিও। পবন বড্ড ধরেছে। তারপর ?

নায়েব : হুজুর, গোরার বাজনার সঙ্গে পবন-ঢুলির ঢাক্‌চড়াচড় কি ঠিক মানানসই হবে ? সেটা কেমন-কেমন হবে না ?

অনন্ত : তা একটু হবে। কিন্তু তবু ওকে বায়না দিতে হবে নায়েব। আমার বিয়ের সময় পবনঢুলির বাপ মহেশ ঢুলির বাজনদারের দল গিয়েছিল বরযাত্রীর সঙ্গে সঙ্গে।

নায়েব : আজ্ঞে, তখন তো ব্যাগপাইপ বাজেনি এমন। তাই বলছি—

অনন্ত : বেখাপ্পা যদি শোনায়,—না হয় বাজনা নাই বাজাবে পবনঢুলি,—চুপচাপই না হয় যাবে। কিন্তু বায়না ওদের দিতেই হবে। রায়বাড়ির ছেলের বিয়ে, কোথাকার কোন্ শহুরে বাজনদার পয়সা নিয়ে যাবে, আর গ্রামের পবন ঢুলির দল ঘাড় হেঁট করে বসে থাকবে? তা হয় না নায়েব, ফর্দে ওদের নামটাও ধরো।

(এমন সময় কোথা থেকে পঞ্চানন ছুটে এসে অনন্ত-নারায়ণের পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে।)

পঞ্চানন : বাবু গো।

অনন্ত : কে রে তুই? কে রে?—দেখ কাণ্ড! আরে ওঠ্ দেখি, তোর মুখখানা দেখি। (পঞ্চানন মুখ তোলে) কে তুই?

পঞ্চানন : আজ্ঞে পঞ্চানন হুজুর।

অনন্ত : চিনলুম না। কোথায় থাকিস? আমাদের এ তিন গাঁয়ের তো নোস্।

পঞ্চানন : হুজুর, গৌরগঞ্জ থেকে আসছি। গৌরগঞ্জে ঘর। দাস পাড়ায়।

অনন্ত : চিনলুম না তো নায়েব।

নায়েব : ঠাকুরের নাম কি?

পঞ্চানন : বাপের নাম শুধোচ্ছ কত্তা? বাপ নেই। চেনেন তারে আপনারা। আমি ভবিচরণের ছেলে হুজুর।

নায়েব ঃ (অনন্ত নারায়ণের প্রতি) সেই যে ভবিচরণ হুজুর ; হরিশ ঠ্যাঙাড়ের ছেলে ভবি ;—পাকানো গোঁফ, কপালের ডান দিকে বড় একটা আঁচিল ছিল। মাঝে মাঝে আপনার কাছে এসে হাত পেতে দাঁড়াত। আপনি বলতেন, হাতের থাবা দুখানা দেখেছ নায়েব,—অমন থাবা খালি রাখতে নেই ; ভরিয়ে দাও, ভরিয়ে দাও। সেই তারই ব্যাটা এ।—কি নাম বললি ?

পঞ্চানন ঃ পঞ্চানন আজ্ঞে।

অনন্ত ঃ তা কাঁদছে কেন ? কি চায় ?

পঞ্চানন ঃ হুজুর গো, বাঁচান আমাকে। আমার ব্যাটার নামে 'দিব্যি' খেয়েছি হুজুর।

নায়েব ঃ কান্না থামা, গুছিয়ে কথা বল্ পঞ্চানন। হুজুরের শরীর ভাল নয়। কাজ রয়েছে অনেক।

পঞ্চানন : আমার বাপের মত বড় থাবা নেই হুজুর। ছোট ছোট হাত আমার। তা' সে হাত আপনাদের কাছে যদি না পাতবো, তো পাতবো কার কাছে হুজুর ?

নায়েব : ফের ভনিতা করছিস ?

পঞ্চানন : বাবা আমার গৌরগঞ্জ থেকে ভুবনপুর ছুটে ছুটে এসে হাত পেতেছে অনেকবার। আমার এই প্রথম আর এই শেষ নায়েবমশাই। জন্মে কখনো আসিনি, আসবও না আর কখনো। শুধু এবারটা বাঁচাও কত্তা। নায়েবের পায়ে ধরতে যায় পায়ে পড়ি আপনার।

নায়েব : এই ছ্যাখো,—ব্যাপারটা কী খুলে বলবি তো, না এমনি পাগলামী করবি ?

পঞ্চানন : বলছি কত্তা, বলছি।—গৌরগঞ্জের রক্ষিত মহাজনের কাছে আমার বাবা করেছিল দেনা। বাবা শোধ করতে পারে নি। চক্রবৃদ্ধি সুদ। বোঝার ওপর বোঝা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

নায়েব : শোধ না করলে দেনা তো বাড়বেই।

পঞ্চানন : শোধ করবার চেস্টাতেই তো বড় ছেলেটাকে গ্রাম ছেড়ে শহরে খাটতে পাঠালুম। সময় চাইলুম কিছু। তা রক্ষিত মহাজন শুনল না কিছুতেই। গালমন্দ করতে লাগল। দু-চারটে কথা কাটাকাটি হল। যা-তা কথা বলল। শুনে পা থেকে মাথা অবধি রক্ত ফুটে উঠল টগ্‌বগ করে। আমার ছোট ব্যাটা গোপ্‌লার নামে দিব্যি করলুম, পনেরো দিনের মধ্যে ওর টাকা আমি শোধ করে দেব, যেমন করেই হোক।

নায়েব : একেবারে ছেলের নামে দিব্যি গেলে বসলি ?

পঞ্চানন : রক্ষিত মহাজন যে বড়ো একটা নোংরা কথা বললে। নোংরা কথা বললে আমার ঘরের বৌয়ের নামে। তাই কেমন রক্তটা ফুটে উঠল।

নায়েব : তা' হুজুরের কাছে এসেছিস কি করতে ? হুজুর কি করবেন ?

পঞ্চানন : আজ্ঞে ঐ টাকাটা যদি—

নায়েব : টাকা ?—হবে না, হবে না এখানে। অন্যত্র যা।

পঞ্চানন : বড় আশা করে যে এইছি কত্তা।

নায়েব : কি করে যে তোরা আশা করিস, বুঝি না। কে কোথায় কার কাছে ধার করবে, কে কার ছেলের নাম নিয়ে দিব্যি গালবে, আর তার খেসারৎ জোগাতে হবে হুজুরকে? হুজুরকে তোরা কি পেয়েছিস বল্ তো?—দিব্যি গালবার সময় মনে হয়নি, টাকাটা জোগাড় হবে কোত্থেকে?

পঞ্চানন : ঠিক তখন হয়নি, কিন্তু তার পরেই মনে হয়েছিল কত্তা। মনে হয়েছিল, আমাদের ভুবনপুরের রাজা আছেন। হোক্ না তাঁর রাজত্বির বাইরে আমার ঘর, তবু তিনি পায়ে ঠেলবেন না। সেই ভরসাতেই—

নায়েব : সেই ভরসাতেই বুক ফুলিয়ে দিব্যি গেলে হেলতে-দুলতে হুজুরের কাছে হাত পাততে এসেছ?

পঞ্চানন : হেলতে-দুলতে নয় কত্তা, বড় ভয়ে ভয়ে দৌড়তে-দৌড়তে এসেছি এই ন-ক্রোশ পথ।

নায়েব : পঞ্চানন, ও-সব বাজে কথা ছাড়্। শোন্ স্পষ্ট কথা। এখানে এখন কিছু হবে না, অন্যত্র ছাখ্।

পঞ্চানন : কত্তা, আমার বাপ-দাদা কেউ আপদে-বিপদে রায়বাড়ি থেকে ফেরেনি কখনো শূন্য হাতে।

নায়েব : ফিরতে হবে। ফিরে যেতে হবে এবার থেকে। শূন্য হাতেই ফিরে যেতে হবে। দেখছিস হুজুরের ছেলের বিয়ে দু'দিন পরে, চারিদিকে কত খরচ-পত্তর,—কি কোরে যে তোরা এই সময়ে—

পঞ্চানন : (অনন্তনারায়ণের উদ্দেশে) হুজুর !

নায়েব : পঞ্চানন, তুই এখন যা ।

পঞ্চানন : টাকাটা আমি ভিক্ষে চাইছি না হুজুর । ধার দিন । বেশি নয়, দু' বছরের মেয়াদে । মাস দুই পরে অনেকখানি শোধ করে দেব ।

নায়েব : (দ্রবীভূত অথচ নিরুপায়) পঞ্চানন, তুই যাবি ? না, বিরক্ত করবি হুজুরকে এমনি করে ?

পঞ্চানন : (উঠে দাঁড়িয়ে) যাচ্ছি কত্তা, যাচ্ছি । টাকার জন্যে অন্যত্র যেতে বলছ ? না, কোথাও যাব না । ভুবনপুরের রায়বাড়ি থেকে যে হতভাগাকে শূন্য হাতে ফিরতে হয়, এ ভুবনে তার কোথাও যাবার ঠাঁই নেই । এখান থেকে সোজা চলে যাব বাড়ি । তারপর ? (যেতে যেতে) পঞ্চাননের সাত সাতটা ব্যাটা ; গেলই বা এক্‌টা মরে ।

অনন্ত : (জোরে) পঞ্চানন !

(পঞ্চানন চমকে ফিরে দাঁড়ায় ।)

অনন্ত : নায়েব, পঞ্চাননকে বলে দাও, আজকের রাতটা আমার অতিথিশালায় থাকতে । কাল সকালে টাকা পাবে ।

পঞ্চানন : (আছড়ে পড়ে পায়ের ওপর) হুজুর ! হুজুর গো !

অনন্ত : পঞ্চাননকে অমন করে কাঁদতে বারণ করে দাও । আমার ভাল লাগছে না । আর, বলে দাও পঞ্চাননকে যে,—ধার নয়,—টাকাটা ভিক্ষে বলেই নিতে হবে । ভুবনপুরের রায়েরা মহাজনী কারবার করে না ।

পঞ্চানন : হুজুর গো, মা-বাপ তুমি, গরীবের দেব্‌তা তুমি—

অনন্ত : কতবার বলব নায়েব যে, পঞ্চাননের কান্নাটা আমার ভাল লাগছে না। যেতে বলে দাও ওকে।

(চোখ মুছতে মুছতে পঞ্চাননের প্রস্থান। ঢং ঢং কোরে ঘণ্টা-ফটকে সাতটার ঘণ্টা বাজল।)

অনন্ত : কাউকে ডেকে আমার কাপড়-চাদর আনতে বলে দাও নায়েব। সাতটার ঘণ্টা বাজল।

নায়েব : হুজুর, অতগুলো টাকা···

অনন্ত : বুঝলুম। কিন্তু ওর বাপ ফেরেনি কোনদিন। ওকে ফেরাই কেমন করে ?

নায়েব : কিন্তু হুজুর—

অনন্ত : কাউকে ডেকে আমার কাপড়-চাদরটা আনতে বল। সাতটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে।

— —

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বাঈমহলের বারান্দা। দূরে করুণ সুরে সানাই বাজছে। রত্না চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে এমনি সময় বরবেশে দর্প প্রবেশ কোরে পিছন থেকে হাত রাখল রত্নার পিঠে। রত্না চমকে উঠল !]

রত্না : তুমি ? বারান্দায় তখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি,—খাসমহল থেকে বর যাবে চতুর্দোলায়, দেখব। ওমা ! কপালে চন্দন দিয়ে বর নিজেই এসে হাজির। এসে বেশ করেছ ; এত দূর থেকে কি দেখা যেত বরের মুখখানি ভাল করে ?—চন্দন কে পরালে গো ? আলোর দিকে একটু সরেই দাঁড়াও না. দেখি বরটিকে কেমন মানিয়েছে।

দর্প : রত্না, চোখের জলটা ভুলে গেছ মুছতে।

রত্না : কই ? বাঃ রে।

দর্প : সবার কাছ থেকে লুকোতে লুকোতে নিজেকে কি আজ নিজের কাছ থেকেও লুকোতে চাও রত্না ? জলটা মুছে নাও।

(রত্না কান্না ঢাকতে মুখ লুকোতে চায়। দর্প বলে—

দর্প : কান্নাটাকে অত কষ্ট কোরে লুকোতে হবে না রত্না। ভুবনপুরের রায়বাড়ি জুড়ে আজ সানাই বাজছে। তোমার কান্না কেউ শুনতে পাবে না।—কই রত্না, আলোর কাছে সরে দাঁড়িয়েছি আমি ; দেখবে না বরটিকে কেমন মানিয়েছে ?

রত্না : এই তো, দেখছি তো।

দর্প : আমিও দেখছি।

রত্না : কী ?

দর্প : রতন বাঈ-এর চিবুকের কাছে চোখের জলের মুক্তো দুটি টল্ টল্ করছে। (একটু থেমে) আমি বাগানের ধারে আমার ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে এসেছি। বাড়ি শুদ্ধ সবাই এখন বরযাত্রীর মিছিল সাজাতে ব্যস্ত।

রত্না : (বিহ্বল) দর্প।

দর্প : (অস্থির কণ্ঠে) ভেবে ছাখো রত্না, এখনও সময় আছে। জীবনের এই গোধূলি লগ্নে, ভেবে ছাখো, কী বেছে নেবে ? পুরোনো সেই বন্ধ্যা দিন, না নক্ষত্রবতী নতুন রাত ?

রত্না : তুমি যাও দর্প। এতক্ষণে হয়তো সকলে খুঁজছেন তোমায়। এখনি হয়তো—

দর্প : (অস্থিরতর কণ্ঠে) খুঁজে খুঁজে ওরা খাসমহলের কোথাও পাবে না দর্পকে। এমন কি খুঁজতে খুঁজতে এই বাঈমহলের বারান্দায় এসে দেখবে সেখানেও নেই দর্পনারায়ণ। তারপর হঠাৎ একসময় শুনবে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। চমকে দেখবে, বাঈমহলের রতনবাঈকেও পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও। দেখবে—

রত্না : (বিহ্বল) দর্প।—

দর্প : রত্না, এমন কোরে······কে ওখানে ?

(নিতাইয়ের প্রবেশ)

নিতাই : আজ্ঞে আমি।

রত্না : (জোর করে সহজ হবার চেষ্টা করে) নিতাই দা ? কি রে ? কি বলছিস্ ? আয় না, এখানে আয়। বলছিস্ কিছু নিতাই দা ?

নিতাই : (আমতা আমতা করে) ঠাকুরমশায়ের স্ত্রী খুঁজছেন ছোটহুজুরকে। বরণ করবার সময় হয়েছে, তাই—

রত্না : ওঃ ! এক্ষুনি যাচ্ছেন। তোদের ছোটহুজুর আমার কাছ থেকে গোলাপী আতর নিতে এসেছিলেন ;—তুলোয় কোরে কানে দেবেন-কি-না। যা নিতাইদা, নিয়ে যা তোদের ছোটহুজুরকে।

দর্প : তুই যা নিতাইদা, আমি যাচ্ছি।

(নিতাইয়ের প্রস্থান)

রত্না : আবার কি ?

দর্প : দূরে নয়, কাছে সরে এস।—আরো কাছে।

(রত্না সরে এসে সামনে দাঁড়াতেই দর্প নিজের গলার মালা খুলে পরিয়ে দিল তার গলায়।)

রত্না : এ কী করলে ?

দর্প : আমাদের মাথার ওপর অনন্ত আকাশ ;—তার কোটি কোটি তারা আমার গলার মালা তোমাকে দিলাম, ওরা দেখেছে।

(রত্না প্রণাম করতে গেল)

দর্প : ওঠ, ওঠ রত্না। গোলাপী আতরটা দাও এনে। তুলোয় করে কানে দেব কি না।- দেরী কোর না। বর বেরোতে দেরী হয়ে যাবে যে !

(রত্না ধীরে ধীরে ভিতরে চলে যায়। দর্প দাঁড়িয়ে থাকে। এমন সময় হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসে খাসমহলের ভৃত্য হরিপদ।)

হরিপদ : খোকাবাবু···খোকাবাবু······খোকাবাবু গো···

দর্প : কি হয়েছে রে হরিপদদা, অমন করছিস কেন ?

হরিপদ : (কেঁদে ওঠে) খোকাবাবু গো···

(হরিপদর কান্নার শব্দ পেয়ে রত্না ফিরে এসে দাঁড়ায় একধারে।)

দর্প : কি হয়েছে বলবি ত ?

হরিপদ : খোকাবাবু, তাড়াতাড়ি ও-মহলে চলুন। বড় হুজুর সাজ-গোজ সেরে নায়েবমশাইয়ের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছিলেন, হঠাৎ কি হল, ঝুপ করে পড়ে গেলেন। এখনও জ্ঞান হয়নি।

দর্প : বাবা !···বাবা অজ্ঞান হয়ে গেছেন !···বাবা অজ্ঞান হয়ে গেছেন !···

(দর্প ছুটে বেরিয়ে যায়। হরিপদ রত্নার মুখের দিকে তাকিয়ে কেঁদে ওঠে প্রায়—)

হরিপদ : কী হবে রতনদিদি ?

রত্না : কাঁদছ কেন হরিপদদা ? অজ্ঞান হয়েছেন,—আবার ভাল হয়ে যাবেন। এর আগেও তো একবার অজ্ঞান হয়েছিলেন।

হরিপদ : কিন্তু রতনদিদি, আজ যে বিকেল থেকে শেকল জড়িয়ে গিয়ে ঘণ্টাফটকের ঘণ্টাটা বাজছে না কিছুতেই। রানীমা যেদিন চিরজন্মের মত চলে গেছলেন রায়বাড়ি ছেড়ে,—সেদিনও বাজেনি ঘণ্টা। বৃন্দাবন ঘণ্টাদার

প্রাণপণে চেষ্টা করেছে ;—পারেনি। আজো পারছে না। কিছুতেই পারছে না।—আমি চলি দিদি।

(হরিপদ চলে গেল। রত্না দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। ভিতর থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে এলেন পিয়ারাবাঈ।)

পিয়ারা: রতন, রতন রে, সন্ধ্যে সাতটার ঘণ্টা বাজতে শুনেছিস তোরা কেউ?

রত্না: না পিসিমা।

পিয়ারা: হ্যাঁরে, আলোবরদারের আলোগুলো জ্বলছে কি?

রত্না: না পিসিমা।

পিয়ারা: সানাই-এর শব্দ পাচ্ছিস শুনতে?

রত্না: না পিসিমা।

পিয়ারা: ওরে,—পাঠা সকলকে ঘণ্টাফটকে। ছুটে যাক সকলে। যে করেই হোক্ ঘণ্টা যে বাজাতেই হবে।—ঘণ্টা যে আজ বাজাতেই হবে।

(টলতে টলতে আবার ফিরে গেলেন পিয়ারাবাঈ। রত্না নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে এল ধীরে ধীরে।)

— ——

তৃতীয় দৃশ্য

[রক্ষিত মহাজনের আম-বাগানের পুকুরঘাট। রাত্রিকাল। মুস্কিল-আসানের বেশে দাঁড়িয়ে আছে একজন। হাতে তার চেরাগের আলো জ্বলছে। লণ্ঠন হাতে ঝুলিয়ে ঢুকল নেপাল রক্ষিত। তাড়ির নেশায় ঈষৎ জড়িত কণ্ঠস্বর।]

নেপাল : এই যে—

মুস্কিল আসান : নমস্কার আজ্ঞে।

নেপাল : পোষাকটা তো নিয়েছ বেশ! চট্ করে চেনা যায় না। মানিয়েছেও হুবহু সত্যিকারের মুস্কিল-আসান। তা হ্যাঁ হে, আমার ব্যবস্থা কি করলে?

মুস্কিল আসান : করব, করব,—সন্ধানে আছি। ভালমত পেলেই ব্যবস্থা করব।

নেপাল : পোড়া যৌবনটা থাকতে থাকতে ব্যবস্থা কোরো।

মুঃ আসান : আপনাদের হল গে অনন্ত যৈবন। শত বছরেও ফুরোবে না।

নেপাল : তা' এত রাতে এখানে? বাবা ডেকে পাঠিয়েছে বুঝি?

মুঃ আসান : আজ্ঞে হ্যাঁ।

নেপাল : ন'পাড়ায় যাচ্ছিলুম। জব্বর খ্যাম্‌টা আছে। পুকুরঘাটে আলো দেখে এগিয়ে এলুম। তা' চলি এখন। বাবাকে বোলো না যেন ন' পাড়ায় যাচ্ছি।

মুঃ আসান ঃ না, না। আমার অত কথায় কাজ কি বলুন না।

নেপাল ঃ আচ্ছা চলি।

(নেপাল চলে গেল। মুস্কিল-আসান একা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ সুর কোরে চেঁচিয়ে উঠল এক সময়—)

মুঃ আসান ঃ ইয়া পীর মওলা, মুস্কিল আসান হ্যায়—

(ঢুকলেন রক্ষিত মহাজন হাতে লণ্ঠন ঝুলিয়ে। মুস্কিল আসান তাকে প্রদক্ষিণ করে ছড়া কাটতে লাগলো—)

মুঃ আসান : বিপদ উদ্ধার করে দাও সত্যপীর। দূর হইয়ে যা আপদ বালাই, দূর হইয়ে যা আপদ বালাই, দূর হইয়ে যা আপদ বালাই,—ফুঃ ফুঃ ফুঃ !

(বিশেষ ভঙ্গিতে চামর ত্থুলিয়ে অকল্যাণ ঝেড়ে দিয়ে চেরাগের ভূষোকালির টিপ পরিয়ে দিলে রক্ষিত মহাজনের কপালে।)

রক্ষিত ঃ ভেকটা তো নিয়েছ নিখুঁৎ। বলি, খোঁজ নিয়েছ আসল কাজের ? পঞ্চানন ফিরেছে ঘরে ?

মুঃ আসান ঃ আজ্ঞা না কত্তা।

রক্ষিত ঃ জানতাম মিঞা, সে যে আর ফিরবে না ঘরে, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে, তা আমি জানতাম। সেদিন সকালে ব্যাটা বড় তেজ দেখিয়ে মস্ত দিব্যি গেলে গেল কি না। তা' কোথায় গেছে জানতে পারলে কিছু ?

মুঃ আসান ঃ না। উয়ারা নিজেরাই জানে না ! পুরুষমানুষ তো নাই কেউ ঘরে। ছেলেরা সব তল্লাসে বেরিয়েছে বাপের। ঘরে আছে শুধু ঐ বাচ্ছা গোপ্‌লাটা।

রক্ষিত : তারপর ? কি করলে ?

মুঃ আসান : উঠানে গিয়ে হাঁক পাড়তেই ঐ গোপ্‌লাটা এল বেরিয়ে। বললে, বাবাকে আমার খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না মুস্কিল-আসান। কি হবে মুস্কিল-আসান ?

রক্ষিত : তুমি কি বললে ?

মুঃ আসান : আমি ?—দেলাম টিপ, ঘুরালাম দুবার চামরটা। বললাম, দূর হইয়ে যা আপদ বালাই, দূর হইয়ে যা আপদ বালাই, দূর হইয়ে যা আপদ বালাই,—ফুঃ ফুঃ ফুঃ।

রক্ষিত : (হেসে) আপদ-বালাই দূর করতেই গেছলে বটে তুমি মিঞা।

মুঃ আসান : ই কথাটা বলবেন না কিন্তু কত্তা। আমার 'জলপড়া' খাইয়া হয় নাই ভাল এ-গাঁয়ের বাচ্ছাগুলানের আমাশা ? গোবর্ধনের ছেলের তড়কা সারে নাই ?—আমার এই যে চেরাগের আলোটা দেখছেন—

রক্ষিত : (কৌতুকে)—তাহার আগুনে এগ্রামে হয় নাই অগ্নিকাণ্ড ?—তারপর কি হল তাই বল।

মুঃ আসান : গোপ্‌লা চলে গেল। তখন গলা চড়িয়ে হাঁক দেলাম, —কই গো বৌমা, কচিটার জন্য 'জলপড়া' নেবে না ?

রক্ষিত : (লালসাসিক্ত কণ্ঠে) এল হারাণের বৌ ?

মুঃ আসান : এল। মাথার কাপড়টা নামায়ে দাঁড়াল এসে। মুখখানি ঝমঝম করছে কান্নায়। রাঙা হাতখানি দেল বাড়ায়ে।—তা' দেলাম,—দেলাম কলা-পাতায় মুড়ে চেরাগের কালি।

রক্ষিত ঃ　আঃ, তারপর কি করলে তাই বল।

মুঃ আসান ঃ　বললাম, মাগো, চক্ষের জল মোছ, আল্লা তোমার শ্বশুরে ফিরায়ে দিবেন।

রক্ষিত ঃ　তারপর ?

মুঃ আসান ঃ　তারপর ? ফিরে আলাম।

রক্ষিত ঃ　ফিরে এলে ? আমি যা বলতে বলেছিলুম, বলোনি ?

মুঃ আসান ঃ　পারলাম কই !

রক্ষিত ঃ　মানে ?

মুঃ আসান ঃ　চেরাগের কাঁপা-কাঁপা আলোয় মুখখানা তার কেমনধারা যে হয়ে উঠল, সেই নোংরা কথাটা তার সামনে আর উচ্চারণ করতে পারলাম না। কেমন জানি একটা—

রক্ষিত ঃ　পারলে না ?

মুঃ আসান ঃ　আজ্ঞা না কত্তা।

রক্ষিত ঃ　এই নিয়ে তিন দিন তুমি ফিরে এলে। এর ফল কি হতে পারে জান ?

মুঃ আসান ঃ　রাগ করবেন না রক্ষিতকত্তা, আমি যাব। আমি বলব। একাজ তো আজ নতুন করছি না।

রক্ষিত ঃ　তাই তো অবাক হচ্ছি শুনে। বলে, জন্ম গেল মুরগী খেয়ে, আজ হলেন বোষ্টম। কবে যাবে ?

মুঃ আসান ঃ　কালই। চেরাগের আলোটা এবার নিবিয়ে দে যাব। চেরাগের আলোয় মুখটা তার যে কেমনপানা দেখায়,—নোংরা কথাটা আর উচ্চারণ করা যায় না।

রক্ষিত ঃ তাই যেও। মোট কথা পরশুর মধ্যেই হেস্তনেস্ত চাই। বুঝলে ?

মুঃ আসান ঃ আজ্ঞা বুঝলাম। নেশ্চয়ই যাব। নেশ্চয়ই করব। আসি তাহলে আজ্ঞে ?

রক্ষিত ঃ এসো।

(মুস্কিল-আসানের প্রস্থান এবং তারপরেই ধীরে ধীরে পঞ্চাননের প্রবেশ।)

রক্ষিত ঃ কে ? পঞ্চানন ? তুই ?

পঞ্চানন ঃ চিনতে কষ্ট হচ্ছে কত্তা ? হ্যাঁ আমি পঞ্চানন দাস। ভবিচরণ দাসের ছেলে, হরিশ ঠ্যাঙাড়ের নাতি। মুস্কিল-আসানের চেরাগের আলোটা থাকলে চিনতে বোধ হয় আরো সুবিধে হত ;—তাই না ?

রক্ষিত ঃ তা হঠাৎ এমন রাতে এখানে ?

পঞ্চানন ঃ তোমার বাড়ির দিকেই যাচ্ছিলুম। তা' পথের মাঝেই দেখা হয়ে গেল হঠাৎ।

রক্ষিত ঃ গলাটা তোর ভারী-ভারী শোনাচ্ছে যেন পঞ্চু ;— সর্দি লেগেছে বুঝি ?

পঞ্চানন ঃ আপ্যায়িতে কাজ নেই। বাজে কথা শুনতে আসিনি। মিঞার সঙ্গে কী কথা হচ্ছিল ?

রক্ষিত ঃ এই, তোর সব খোঁজখবর নিচ্ছিলুম। আহা, হাজার হোক এক গাঁয়ের লোক তো রে। এক গাঁয়ের জল-বাতাসে আমরা মানুষ তো বটে।

পঞ্চানন ঃ মানুষ ! তুমি ! মানুষকে অতবড় গালটা নাই বা দিলে।

রক্ষিত ঃ বড্ড রেগেছিস, না রে পঞ্চু ? আহা, হবে না,—কদিন থেকে পথে পথে ঘুরছিস,—নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, আহার নেই, নিদ্রা নেই,—মাথা একটু বেঠিক হবে বৈকি। এর ওপর যদি আবার ঘরের খবরটা শুনতিস্…

পঞ্চানন ঃ কী কথা ?

রক্ষিত ঃ স্বাভাবিক বাবা,—বয়েসের ধর্ম।

পঞ্চানন ঃ স্পষ্ট করে বল।

রক্ষিত ঃ মানে, ডাগর বৌ, ভরা-যৌবন, তার ওপর তোর ছেলে হারানটাও ক'মাস থেকে বাইরে,…

পঞ্চানন ঃ (চেঁচিয়ে) রক্ষিতকত্তা !

রক্ষিত ঃ (শান্তকণ্ঠে) কি হল রে ? বিছে-টিছে কামড়ালো কিছু পায়ে ?

পঞ্চানন ঃ একটা কথা তোমাকে বলে দিচ্ছি কত্তা,—ঘরের বৌ-ঝির সম্বন্ধে ফের যদি কোনদিন—

রক্ষিত ঃ অত চেঁচিয়ে কথা কসনে পঞ্চানন।

পঞ্চানন ঃ ফের যদি কোনদিন আমার ঘরের বৌ-ঝির সম্বন্ধে কোন কথা বলেছ,—জিভ তোমার ছিঁড়ে ফেলে দেব।

রক্ষিত ঃ পায়ের জুতো পায়েই থাকিস পঞ্চানন।

পঞ্চানন ঃ জুতো !—জুতো দেখাচ্ছ তুমি !—জানোয়ার কোথাকার। ফের যদি কোনদিন শুনি যে আমার বৌমার পেছনে চর লাগিয়েছ, তাহলে—

রক্ষিত ঃ তাহলে কি করবি ?

(হঠাৎ মাথার মধ্যে কী যে হয়ে যায়, পঞ্চানন দুহাতে

রক্ষিতের গলা টিপে ধোরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলতে থাকে—)

পঞ্চানন : এই এমনি করে, এমনি করে, এমনি করে—

(হাঁপানীর রোগী রক্ষিতের দম বন্ধ হয়ে আসে। ছটফট কোরে ছাড়াবার চেষ্টা করে। পঞ্চানন তবু ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলে—)

পঞ্চানন : যদি না ছাড়ি,—যদি না ছাড়ি,—যদি—

(পঞ্চানন সভয়ে ছেড়ে দিল গলা। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার তা হয়ে গেছে!—সর্বনাশ! পঞ্চাননের সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল ভয়ে। বারবার সে হাত রাখল রক্ষিতের নাকের তলায়। তার মাথাটা তুলে নাড়া দিলে দুবার। চোখের পাতা ওল্টালে।—সাড়া নেই! পঞ্চাননের মাথা ঘুরতে লাগল! উত্তেজনার মাথায় এ কী করে বসল সে! সে শুধু জানিয়ে দিতে চেয়েছিল, মেয়েছেলের দিকে কুনজর দেবার চেষ্টা করলে তার ফল কী হতে পারে। হাঁপানীর রুগীটা একটু ঝাঁকুনিতেই যে······! কোমরের কাপড়ের ভাঁজ থেকে অনন্তনারায়ণের কাছ থেকে পাওয়া টাকার থলেটা বের কোরে পঞ্চানন নামিয়ে রাখল প্রাণহীন রক্ষিতের জীর্ণ বুকের ওপর। তারপর রক্ষিতের শবদেহটার কানের কাছে মখ নিয়ে গিয়ে চীৎকার করে বলল—)

পঞ্চানন : শুনে যাও রক্ষিত কত্তা। শুনে যাও যাবার আগে। তোমার টাকা আমি ফিরিয়ে দিয়ে গেলুম। ছেলের নামে দিব্যি করেছিলুম; কথার খেলাপ আমি করিনি,—কথার খেলাপ আমি করিনি।

(কথা শেষ কোরে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে পঞ্চানন পালাল ছুটে। রক্ষিতের প্রাণহীন দেহটা পড়ে রইল পুকুরঘাটে। আর, তার বুকের ওপর পড়ে রইল সেই টাকার থলেটা।)

চতুর্থ দৃশ্য

[বাঈমহলের বারান্দা। রত্না চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। নিতাই চাকর একটা বোঁচকা নিয়ে এক দিক থেকে আর এক দিকে চলে গেল। তার কিছুক্ষণ পরেই ধীরে ধীরে ঢুকলেন পিয়ারাবাঈ। এই ক'দিনে অনেক বয়স বেড়ে গেছে তাঁর। পরণে শাদা থান, গায়ে থানের ওপর একটা হাল্কা রঙের কাজ-করা চাদর। প্রায় নিরাভরণা। পিছনে দাঁড়িয়ে হাত রাখলেন রত্নার পিঠে।]

পিয়ারা: কি রে? পালিয়ে এসে একলাটি এইখানে দাঁড়িয়ে আছিস? (রত্না নীরব)

পিয়ারা: চিরকাল কি পিসির আঁচল ধরে বেড়ায় নাকি মেয়েরা?

(রত্না তবু নীরব)

পিয়ারা: পিসি বুড়ি হয়েছে, তীর্থধর্ম করতে যাবে না?

(রত্না এইবার ফিরে জড়িয়ে ধরে পিয়ারাকে)

রত্না: আমি এখানে একা থাকতে পারব না পিসিমা। তুমি আমাকে নিয়ে চল বৃন্দাবনে। আমি তোমার সঙ্গে যাব।

পিয়ারা: (সস্নেহে) পাগলী মেয়ে।

(নিতাইয়ের পুনঃপ্রবেশ)

নিতাই: মাগো, বদনমাঝি খবর দিয়েছে, বজরা ওর তৈরী। পাল্‌কি কি এখনই ভেতরের উঠোনে আনতে বলব?

পিয়ারা: হ্যাঁরে, এখনি। ঠাকুরমশাই দিনক্ষণ দেখে দিয়েছেন, —দেরী করবার তো উপায় নেই।

(নিতাই চ'লে গেল)

রত্না ঃ আমি যাব। পিসিমা, আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

পিয়ারা ঃ যাবি, যাবি, যাবি বৈকি একদিন। চুল পাকুক, দাঁত পড়ুক,—যাবি সেদিন তীর্থে। কিন্তু এখন তো উপায় নেই মা যাবার। এখানে এখন তোর যে অনেক দায়িত্ব রইল রে।

রত্না ঃ কিন্তু পিসিমা—

পিয়ারা ঃ না, কান্না নয়। আমার যাবার সময় চোখের জলে পথ পিছল করিস নি মা গো। ভুলে যাসনি, এই বাঈমহলের পঞ্চমা মালিকান্ হ'লি তুই আজ থেকে। রত্না নয় ;—রতনবাঈ জয়পুরী। একদিন এই বাঈমহলের ইজ্জতের ভার, খাসমহলের মালিকের ভার, সবকিছু আমার হাতে তুলে দিয়ে গেছলেন কমলাবাঈ। এ জীবনে জ্ঞানতঃ সে কর্তব্যে ত্রুটি করিনি কোনদিন। আজ বিদায় নেবার আগে সে-ভার আমি দিয়ে যাচ্ছি তোর ওপর। জানি, তুইও অবহেলা করবি না কোনদিন।

রত্না ঃ কিন্তু পিসিমা, এতকাল বাঈমহলের নাচঘরে আলো জ্বলেছে খাসমহলের মালিকের মুখ চেয়ে। আমি নাচঘর আগলে বসে থাকব কার জন্যে ? কে শুনবে গান ? কে আসবে নাচঘরে ?

পিয়ারা ঃ যে আসবার,—যে শোনবার।

রত্না ঃ কোথায় সে ?—তোমারও অনেক আগে তার বজরা ছেড়ে গেছে ভুবনপুরের নদীর ঘাট।

পিয়ারা ঃ ভুল করিস নি রত্না। দর্প তো চিরকালের জন্যে ভুবনপুর ছেড়ে যায় নি। বাইরে ঘুরে বুকটাকে খালি করতে চায়; তাই বেরিয়ে পড়েছে নৌকোয়। কিছুদিন বাদেই সে আবার আসবে ফিরে। কিন্তু সেদিন ফিরে এসে সে যদি খুঁজে না পায় কাউকে,—যদি বাঈমহলের নাচঘরে আলো না দেখতে পায়,—যদি—

রত্না ঃ জ্বলবে পিসিমা, জ্বলবে। নাচঘরের আলো সে পাবেই পাবে দেখতে। ভুল হবে না আমার কোনদিন। যে ভার তুমি দিয়ে যাচ্ছ, জ্ঞানতঃ অবহেলা করব না তার কোনোকালে।

পিয়ারা ঃ (সস্নেহে) জানি, জানি, আমি জানি রে,—আমি জানি।

(রত্না হেঁট হয়ে প্রণাম করে। পিয়ারা সমুখের পানে তাকিয়ে বলেন—)

পিয়ারা ঃ এসেছিলুম কতদিন আগে।—কতদিন। অশথ্‌-তলার চাতালে বোসে গান গাইতো একটি বুড়ো। আমায় সে মা বলে ডাকতো। আজ সকালে অশথ্‌তলায় প্রণাম করতে গিয়ে দেখি, এখনো গাছের গুঁড়িতে লেগে আছে তার মাথার তেলের দাগ। মানুষটা নেই, চিহ্নটা রেখে গেছে।—সকালে নবরত্নের মন্দির থেকে বেরোচ্ছি, পা-খোঁড়া কুকুরটা এসে দাঁড়াল মুখের পানে চেয়ে—

(নিতাইয়ের পুনঃপ্রবেশ)

নিতাই ঃ মাগো, সময় চলে যায় যে।

পিয়ারা : ওঃ, হ্যাঁ, হ্যাঁ ; যাই, যাই।

(চোখ মুছলেন পিয়ারা। রত্না প্রণাম সেরে উঠে আর
(একবার পিয়ারার বুকে নিজের অশ্রুসিক্ত মুখ লুকোয়।
দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে পিয়ারাবাঈ বলতে থাকেন—)

পিয়ারা : অনেকদিন আগে ঘণ্টাফটকের তলা দিয়ে এসেছিলেন একদিন এ মহলের প্রথম বাঈ, মুন্নিবাঈ জয়পুরী,—হাতীর পিঠে রূপোর হাওদায়। ফিরেও গেছেন রূপোর চৌদোলায়, মর্যাদার আসনে। ওরে, সেই মর্যাদার আসন থেকে কেউ যেন না নামাতে পারে তোকে কোনদিন।

(রত্না আরেকবার হেঁট হয়ে প্রণাম করে।)

———

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

খাসমহলের কক্ষ। সন্ধ্যা। দর্পনারায়ণ বাঈমহলে যাবার জন্য উৎসবের পোশাকে সেজেগুজে তৈরী হয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে। মুখে গুন্‌গুন্ করছে কোন ঠুংরীর কলি। পুরাতন ভৃত্য হরিপদ একটা বড় ট্রেতে পাগড়ি বাঁধার বেনারসি কাপড় একধারে রেখে চলে যাচ্ছিল, দর্পনারায়ণ চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতেই বললে—]

দর্প : কি রে ওটা হরিপদদা ? কি আনলি ?

হরিপদ : পাগড়ি বাঁধার কাপড়।

দর্প : তাহলে পাগড়িই বাঁধবো বলছিস ?—ঠিক আছে। তাই হবে। আজ পাগড়ি, তার ওপর পালখের মুকুট সব লাগিয়ে একেবারে পুরোপুরি 'ভুবনপুরের রায়' হয়ে ঢুকবো ওখানে। ঠিক আছে। কিন্তু···হ্যারে হরিপদদা, পাগড়ি-ফাগড়ি মাথায় আমার মানাবে তো রে ? সঙ্-সঙ্ দেখাবে না তো ?

হরিপদ : কী যে তুমি বলো।

(হরিপদ চলে গেল। একটু পরেই ঢুকল বৈরাগীদা।)

বৈরাগী : দাদাভাই ?

দর্প : আরে ! বৈরাগীদা !

(দর্প এগিয়ে গিয়ে আলিঙ্গন করল।)

দর্প : আজই ফিরলুম বৈরাগীদা। সকালবেলা।

বৈরাগী ঃ সেই শুনেই তো ছুটে এলুম আমার রাজা-ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে। ভাল আছ ?

দর্প ঃ ভাল আছি বৈরাগীদা। বোসো তুমি।

বৈরাগী ঃ বসি। (বসল)

দর্প ঃ মাস আষ্টেক বজরায় কোরে বাইরে-বাইরে ঘুরে অনেক দেখলুম, অনেক শিখলুম বৈরাগীদা। কত রকমের মানুষ, কত রকম করে জীবন কাটাচ্ছে। সকলেই ভাবছে, তার পদ্ধতিটাই ঠিক, তাঁদের সমাজের বিধানটাই অমোঘ। নদীর এপারের সমাজের বিধানের সঙ্গে ওপারের সমাজের বিধান মেলে না দেখলুম চোখে। কিন্তু মজার কথা এই, দু-পারই ভাবছে, তারা যেটা মেনে চলেছে, সেইটেই হচ্ছে ধর্মসঙ্গত,—অন্যরা ভুল করছে।

বৈরাগী ঃ ঠাকুরকে নিয়েও ত তাই। নানা মুনির নানা মত।

—'তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজেদে।
তোমার ডাক শুনি সাঁই, চলতে না পাই
রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মরশেদে ॥'

আমাদের গুরু গোঁসাই তো তাই গেয়ে গেছেন,—সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।

(খাবারেব প্লেট নিয়ে ঢোকে ভৃত্য হরিপদ।)

দর্প ঃ উঁহু, এখন খাবার-টাবার নয়।—তারপরে জান বৈরাগীদা, যেকথা বলছিলুম,—

(বলতে গিয়ে মাঝপথে থেমে প্রস্থানোদ্যত হরিপদকে বলে—)

দর্প ঃ হ্যাঁরে হরিপদদা, আসল কথাটাই জিজ্ঞেস করা হয়নি তোকে এতক্ষণ। বাঈমহল আজ কি রকম সাজিয়েছে রে ?

হরিপদ ঃ ওরে বাবা! সে যেন ইন্দ্রপুরীর তুল্য। বড় বড় কত্তো যে সব গাইয়ে-বাজিয়ে এসেছেন বাইরে থেকে।

দর্প ঃ আচ্ছা!—রতনবাঈ তাহলে অনেক টাকা খরচ করেছে বল্ ?

হরিপদ ঃ খরচ বলে খরচ! বাঈমহল আর খাসমহলের চাকর-বাকর দাসী-বামুন যে যেখানে আছে, সব্বাইকে নতুন কাপড় আর দুটো কোরে টাকা বিলিয়েছেন।

দর্প ঃ ঠিক আছে, আমিও সকলকে কাপড় আর চারটে করে টাকা দেব। ডেকে দিস তো একবার নায়েবমশাইকে। আর, দ্যাখ্, ওগুলো রেখে তুইও একবার আসিস। পাগড়িটা এঁটে দিবি মাথায়।

(হরিপদর প্রস্থান)

র্প ঃ আজ বারোই কার্তিক; বাঈমহলের প্রতিষ্ঠার দিন; জান বৈরাগীদা। চারপুরুষ আগে ঠিক এই দিনেই বাঈমহলে প্রথম সারেঙ্গি বেজেছিল।

বৈরাগী ঃ জানি বৈকি। রতনদিদি ডেকে বললে, 'কী তোমায় দেব আজ বৈরাগীদা? একতারাটা মুড়ে দেব সোনা দিয়ে?' বললুম, ইচ্ছে হয় দিও তাই। কিন্তু আমার একতারা এরপর বেসুরো বললে রাগ কোরো না তখন।

দপ ঃ শুনে কি বললে ?

বৈরাগী ঃ শুনে বললে,—'তবে থাক্ বৈরাগীদা'।

দর্প ঃ (হেসে বললে) ভয় পেয়ে গেছে।

বৈরাগী ঃ তা' তুমি বুঝি একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক দিন মিলিয়ে ফিরে এলে আজ ?

দর্প ঃ হ্যাঁ। ঠিক তাই। দিন দেখেই তো এলুম। বাইরে থেকে কদিন আগে চিঠি দিয়েছিলুম যে রতনকে। লিখেছিলুম,—'রতন, কোনো ১২ই কার্তিকেই উৎসব বন্ধ থাকেনি বাঈমহলে। চারপুরুষ ধরে যা চলে আসছে, এবারেও তার ব্যতিক্রম হবে না। ভাল করে উৎসবের আয়োজন করো। আমি যাচ্ছি। পৌঁছচ্ছি গিয়ে ঠিক ১২ই কার্তিকের দিন। একদিন আগেও নয়, একদিন পরেও নয়। সেই উৎসবের দিনের আসরে নতুন পবিচয়ে নতুন কোবে প্রথম দেখা হবে তোমাতে আমাতে।'

বৈরাগী ঃ এসে দেখা হয়েছে তো রতনদিদির সঙ্গে ?

দর্প ঃ উঁহু।—ও দিকেই যাইনি।

বৈরাগী ঃ কেন ?

দর্প ঃ বাঃ। আজ তো আর আমি দর্প নই বৈরাগীদা, আজ যে আমি রায় দর্পনারায়ণ রায়। মস্ত ভারিক্কি লোক।

(হেসে উঠল উভয়ে)

দর্প ঃ ঘণ্টাফটকের ঘড়িতে যখন আজ ঢং ঢং করে সাতটার ঘণ্টা বাজবে,—তখন গোঁফের ডগায় মোম ছুঁইয়ে, কানে আতর গুঁজে, কস্তুরি-কিমামদার পান মুখে দিয়ে ঢুকব তার মহলে ;—রুমালে মোহর বেঁধে।

(আবার হেসে উঠল দুজনে)

দর্প : কিন্তু আমি কি ভেবেছিলুম জান বৈরাগীদা ?

বৈরাগী : কা ?

দর্প : ভেবেছিলুম, রত্না নিশ্চয়ই থাকতে পারবে না,—ও' নিশ্চয়ই নিতাইদাকে পাঠাবে আমাকে ধরে নিয়ে যাবার জন্যে।

বৈরাগী : (কৌতুক কোরে) রত্নাও তো আজ রত্না নয়, সে যে আজ রতনবাঈ জয়পুরী।

(দুজনের হাসি)

দর্প : আচ্ছা বৈরাগীদা, রতনের সঙ্গে যখন প্রথম দেখা হবে আজ,—ও' কি বলবে বল তো ?

বৈরাগী : বলবে—(গুনগুনিয়ে)

এতদিন পরে বঁধুয়া এলে,
দেখা না হইত পরাণ গেলে।
আমি এতেক সহিনু অবলা বলে,
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে।

দর্প : মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় জান বৈরাগীদা ?

বৈরাগী : কী ?

দর্প : মনে হয়, এমন না হয়ে আমরা দুজনে হতুম যদি সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়ে,—নদীর ধারে ছোট্ট একটি ঘর থাকত আমাদের.—ছোট্ট একটি বাগান,—তাতে একটি কনকচাঁপার গাছ,—তুমি সর্বদা থাকতে আমাদের পাশে পাশে।—

(পাগড়ির ওপরে আঁটবার পালখের মুকুট নিয়ে হরিপদর প্রবেশ।)

বৈরাগী : (কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলে) হল না ভাই! তোমার রাজমুকুট এসে গেছে!—পালাই এখন আমি।

(বৈরাগী প্রস্থানোদ্যত হল)

দর্প : কাল কিন্তু যাচ্ছি আমি বৈরাগীদা, তোমার শ্যামের মন্দিরের চাতালে। কাল তোমার মুখে নতুন গান চাই।

বৈরাগী : বেশ, কথা রইল। চলি।—

(বৈরাগীর প্রস্থান)

দর্প : হরিপদদা, পাগড়িটা বাঁধবার আগে ভেতরের ঘর থেকে আমার আতরের শিশিটা একবার এনে দে তো।

(হরিপদ যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। দর্পর অলক্ষ্যে দরজার কাছে কখন্ নেপাল রক্ষিত এসে দাঁড়িয়েছে।)

হরিপদ : খোকাবাবু,—

দর্প : কি রে? কি বল্? (ফিরেই চোখে পড়ে নেপালকে) কে আপনি?

নেপাল : আমি? হুঁ-হুঁ-হুঁ—চিনবেন। একটু পরে।

দর্প : তার মানে? কে আপনি? আঃ, কে আপনাকে ভেতরে আসতে দিয়েছে? হরিপদদা, হরিসিং কোথায়? ডাক্ তাকে।

নেপাল : আস্তে। চেঁচিয়ে লাভ নেই। হরিসিং মানে আপনাদের সেই দরোয়ান তো? সে দেখেছে যে, আমি এসেছি। আরে দাদা—

(নেপাল ঘরের মধ্যে এগিয়ে আসে)

দর্প : আপনি ভেতরে এগিয়ে আসছেন কোন হিসেবে?

নেপাল ঃ হিসেব ? নাঃ, এবার আপনি হাসালেন আমায়। আরে মশাই, এ বাড়ির সঙ্গে যে আমাদের তিনপুরুষের কুটুম্বিতে। চাক্ষুষ আলাপ নেই, তাই চিনতে পারছেন না।

দর্প ঃ হরিপদদা, নায়েব মশাইকে ডেকেছিলি তখন ?

(হরিপদ বেরিয়ে যায়, এবং তার বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নায়েব এসে ঢোকেন।)

দর্প ঃ এই যে নায়েবমশাই। কে এ ? কে ঢুকতে দিয়েছে একে বাড়ির ভেতরে ? কী করে হরিসিং যে, একটা উটকো লোক রায়বাড়ির অন্দরমহলে ঢুকে পড়ে ?

নায়েব ঃ ইনি হচ্ছেন—

দর্প ঃ যিনিই হন, বাইরের অচেনা লোক অন্দরে কেন ? দিন-দিন আপনাদের বুদ্ধিসুদ্ধি কি লোপ পাচ্ছে নায়েব মশাই ?

নেপাল ঃ আরে এই ছাখো, কী কাণ্ডমাণ্ড! খামোকা নায়েবকে তম্বি করে ছাখো ! আরে দাদা, নায়েবমশাইয়ের বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পায়নি মোটেই। উনি বলেছিলেন আমায় বাইরের হলঘরে অপেক্ষা করতে। তা সে আমিই রাজি হলাম না কি না। কেমন একটা—

দর্প ঃ নায়েবমশাই—

নেপাল ঃ অবিশ্যি নায়েবমশাই আমাকে অনুরোধ করছিলেন যে, সন্ধ্যে সাতটার সময় আপনি নাকি আপনাদের ও-মহলের বাঈজীর কাছে যাবেন, তখন ফাঁকায় ফাঁকায় ওপরে উঠে—

দর্প : নায়েবমশাই !

নেপাল : আহা, কথাটা আমার শেষ করতে দিন না দাদা আগে।

দর্প : কোন কথা আমি শুনতে চাই না। আপনি যাবেন কিনা এখান থেকে ?

নেপাল : (ভ্রূক্ষেপ না কোরে) খাসমহলের অন্দরমহলটা ঘুরে ফিরে সব দেখলুম নায়েবমশাই। মন্দ নয়, বাস করা যাবে। তবে, অনেকদিনের পুরোনো বাড়ি, একটু-আধটু অদল-বদলের দরকার।

দর্প : (রেগে) আমি জানতে চাই নায়েবমশাই, এর কোনো ব্যবস্থা আপনি করবেন, না আমাকে নিজের হাতেই করতে হবে ?

নেপাল : হ্যাঁ ! রায়বংশের বনেদী মেজাজটা পেয়েছেন ; এটা মানতেই হবে। কিন্তু দাদা, দুঃখের বিষয় তার ঐশ্বর্যটা পেলেন না। তা আর কি করবেন বলুন, যে যেমন ভাগ্য করে এয়েছে। বরাৎ দাদা, বরাৎ !—যাক্, আজ না হয় চলি। আপনাদের নায়েবমশাই অনেক করে অনুরোধ জানিয়েছেন, আজকের দিনে হাঙ্গামা-হুজ্জুৎ কিছু না করতে।—আজ নাকি একটু ইয়ে, মানে ফুর্তি করতে যাচ্ছেন ?—বলি বাঈজীটি দেখতে কেমন ?

দর্প : বেল্লিক ! অনেকক্ষণ ধরে তোমাকে আমি চুপ করে সহ্য করে যাচ্ছি। বেরিয়ে যাও। এখনি বেরিয়ে যাও।

নায়েব : (সন্ত্রস্ত) খোকাবাবু, খোকাবাবু—

নেপাল : আপনাদের খোকাবাবুটি একটু বেশিরকম তড়পাচ্ছেন না নায়েবমশাই ?

নায়েব : খোকাবাবু, ইনি—

দর্প : আঃ, যিনিই হোন্, রায়বাড়ির নাগরার ছাপটা জামায় এঁকে নেবার সাধ যদি না থাকে, তাহলে এই মুহূর্তে ওকে চলে যেতে বলুন।

নেপাল : কি বললে ? নাগরা ? নাগরা দেখাচ্ছ ?

নায়েব : নেপালবাবু, নেপালবাবু—

(ঢং ঢং করে সাতটার ঘণ্টা বাজল। চুপ করে গেল সকলে। বাজনাটা থামতেই দর্প গম্ভীরকণ্ঠে বললে—]

দর্প : এঁকে বাইরে যেতে বলুন। এঁর যা বক্তব্য কাল সকালে শুনব। সাতটা বাজল।

নেপাল : কিন্তু আর তো আমি অপেক্ষা করতে পারি না দর্পনারায়ণ রায়। অপেক্ষা করতাম। অপেক্ষা করবার কথাও দিয়েছিলাম নায়েবমশাইকে। কিন্তু ঐ নাগরা দেখিয়ে তুমি—

দর্প : তুমি !

নেপাল : শোন, শোন হে ফোতো-কাপ্তেন দর্পনারায়ণ,—

নায়েব : রক্ষিতমশাই, আমি করজোড়ে অনুরোধ করছি ; আজকের দিনটা, শুধু আজকের দিনটা যেতে দিন। যা বলবার, যা জানাবার, কালকে জানাবেন। শুধু এই আজকের রাতটুকু।—

নেপাল : দয়া ?

নায়েব : নাহয় তাই মনে কর বাবা।

নেপাল : আচ্ছা, তাহলে নাহয় কালই হবে। খুব বেঁচে গেলে হে দর্পনারায়ণ। বুড়োমানুষ হাতজোড় করলেন,—যাক, যাও, জীবনের শেষ ফুর্তিটা করেই এস।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

দর্প : দাঁড়াও।—কি তোমার বলবার, আজই বল ; আমি শুনব। ভুবনপুরের রায়েরা কারুর দয়া ভিক্ষা করে না।

নায়েব : খোকাবাবু, আজ, থাক, কাল শুনবেন।

দর্প : আপনি থামুন নায়েবমশাই। আমি বেশ বুঝতে পারছি, কি একটা গভীর রহস্য বাবা মারা যাবার পর থেকে আপনি ক্রমাগত আমার কাছে গোপন করে আসছেন। কী সে রহস্য, যার জন্য বাইরের একটা লোক অনায়াসে রায়েদের অন্দরে ঢুকে আসে ? শুনব আমি। বল, কি তোমার বলবার আছে।

নায়েব : খোকাবাবু—

দর্প : খোকাবাবুর বয়েস হয়েছে নায়েবমশাই। সব কিছু তার জানা দরকার। বল, বল তোমার কি বলবার আছে ?

নায়েব : একটু দাঁড়ান নেপালবাবু,—আমি দরজাটা একটু বন্ধ করে দিই আগে।

(নায়েব দরজা বন্ধ করতে গেলেন—)

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বাঈমহলের বারান্দা। রতনবাঈ উৎসবের উপযোগী বেশভূষায় সেজে অপেক্ষা করছে অস্থিরভাবে। ঢং ঢং করে রাত ৮টা বাজল। নিতাই এসে ঢুকল।]

নিতাই : ঘণ্টাফটকের ঘড়িতে রাত আটটা বাজল দিদি।

রত্না : শুনেছি।

নিতাই : খাঁ-সাহেব তানপুরো নিয়ে তৈরি।

রত্না : খবর পেয়েছি।

নিতাই : নাচঘরে সবাই অপেক্ষা করছেন তোমার জন্যে।

রত্না : জানি।

নিতাই : অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন সবাই।

রত্না : সবায়ের অপেক্ষাটাই শুধু তুই দেখলি নিতাইদা। আর, আমি অপেক্ষা করছি না? সন্ধ্যে সাতটা থেকে দাঁড়িয়ে আছি এই বারান্দায় খাসমহলের পথের দিকে চেয়ে। আটমাস বাদে আজ সে প্রথম আসবে। রাত আটটা বাজল, এখনো তার সময় হল না?

নিতাই : হয়ত জরুরী কোন কাজে—

রত্না : কাজ! বাঈমহলের মজলিসে আসার চেয়েও আর কোন জরুরী কাজ থাকতে পারে নাকি তার আজকে? কী? কী সে এমন জরুরী কাজ, যা সাতটার ঘণ্টা শুনেও বন্ধ হয় না? কী সে এমন দরকার, যা বারোই কার্তিকের কথাও ভুলিয়ে দেয়?

নিতাই ঃ হয়তো—

রত্না ঃ জানিস নিতাইদা, একদিন ঘোড়ায় করে আমাকে নিয়ে পালাতে চেয়েছিল সে। আর একদিন তারায় ভরা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে…মিথ্যেবাদী, মিথ্যেবাদী! ওদের কোনো কথাটা সত্যি নয়। ওরা সব বানিয়ে বলে, নাটক করে, মিথ্যে বলে।

নিতাই ঃ কিন্তু দিদি, ভুলে যেও না, তোমারই নেমন্তন্নে নাচঘরে সবাই—

রত্না ঃ বলে দে, হবে না, হবে না, কিছুই হবে না আজ। যেতে বলে দে সবাইকে।

নিতাই ঃ কিন্তু—

রত্না ঃ না, না, না। কাউকে থাকতে হবে না, কাউকে থাকতে হবে না আজ বাঈমহলে। নিবিয়ে দে বাঈমহলের সব আলো। তবু দাঁড়িয়ে রইলি? যা—যা…যা তুই এখান থেকে।

(নিতাইয়ের প্রস্থান)

রত্না ঃ নিতাই দা, নিতাই দা, শোন।

(নিতাইয়ের পুনঃ প্রবেশ)

রত্না ঃ না, না, যেতে হবে না কাউকে। জ্বেলে দে নাচঘরের সব আলো। নিয়ে আয় আমার পাঁয়জোড়, বাজাতে বল সারেঙ্গী। পাঁয়জোড় আর সারেঙ্গীর শব্দ কোন বারোই কার্তিকেই বন্ধ থাকেনি বাঈমহলে। আজও বন্ধ থাকবে না। কারুর জন্যেই না, কারুর জন্যেই না।

(রত্না উত্তেজিত ভাবে প্রস্থান করে। নিতাই অনুসরণ করে তাকে।

কয়েক মুহূর্ত পরেই প্রকাণ্ড একটা গড়গড়া নিয়ে কোনো একটি ভৃত্য বাইরের দিক থেকে এসে ভিতরের দিকে চলে যায়। চলে যায় মস্ত একটা তানপুরা নিয়ে আর এক ভৃত্য। নেপথ্য থেকে তবলার আওয়াজ এবং সারেঙ্গীর সুর ভেসে আসে। ভেসে আসে ঘুঙুরের শব্দ। অর্থাৎ ভিতরে সুরু হয়ে যায় উৎসবের জলসা।

এমন সময় ধীর পদক্ষেপে প্রবেশ করে দর্প। বারান্দার মাঝখানে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। শুনতে পায় সারেঙ্গীর শব্দ। আর এগোয় না। বারান্দার পাঁচিলে ঠেস দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে একা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে ঘুঙুরের শব্দ।

প্রবেশ করে বৈরাগীদা।]

বৈরাগী : কি গো রাজাভাই ? এখানে দাঁড়িয়ে ?

দর্প : উঁ ?—হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে আছি। জানো বৈরাগীদা, এ সময়ে ঠিক তোমাকেই বোধহয় খুঁজছিলুম মনে মনে।

বৈরাগী : তাই নাকি রাজাভাই ? এই ছাখো! ঠিক এসে পড়েছি। প্রাণে প্রাণে তার বাঁধা যে গো। তা' এখানে দাঁড়িয়ে ? ভেতরে যাবে না ?

দর্প : উঁ ?—ভেতরে ?—নাঃ।—ভুবনপুর ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে বৈরাগীদা।

বৈরাগী : কি হয়েছে তোমার রাজাভাই ? কী হয়েছে ?

দর্প : হয়েছে ?—একটা ঝড়! সেই ঝড়ে আমার সবকিছু ওলোটপালোট করে দিয়ে গেল! ভুবনপুরের খাসমহলে তোমার রাজাভাইয়ের আর ঠাঁই হল না বৈরাগীদা।

বৈরাগী ঃ বুঝতে পারছি না তোমার কথা।

দর্প ঃ নাগরির গুড় নাকি খালি হয়ে আসছিল বহুকাল থেকেই। বাবার আমলে নাকি গুড় চাঁছতে গিয়ে নাগরির মাটিই উঠে এসেছিল বেশি। দর্পনারায়ণের জন্যে সেটুকুও রইল না আর।

বৈরাগী ঃ কী বলছ তুমি দাদাভাই ?

দর্প ঃ কাছারিবাড়ির চারপুরুষের সেই জাজিম-পাতা গদিতে মখমলের উঁচু তাকিয়ায় ঠেস দেওয়া আর হল না দর্পনারায়ণের। টানা হল না রূপো-বাঁধানো লক্ষ্ণৌয়ের আলবোলায় গাজিপুরী তামাকের ধোঁয়া।—কিছুক্ষণ আগে গৌরগঞ্জের নেপাল রক্ষিত অন্দরে ঢুকে এসে জানিয়ে দিয়ে গেল আজ ভুবনপুরের রায়েদের আসল অবস্থাটা। আরো জানিয়ে দিলে যে, সপ্তাহখানেকের মধ্যে সে শুধু জমিদারীর নয়, খাসমহলেরও দখল নিতে চায়। বৈরাগীদা, রায়েদের সবকিছু আজ বাঁধা পড়ে গেছে রক্ষিতদের সিন্দুকে।

বৈরাগী ঃ সমস্ত ব্যাপারটা হেঁয়ালীর মতো ঠেকছে যে আমার কাছে। মাথার মধ্যে সবখানি ধরে রাখতে পারছি না।

দর্প ঃ হেঁয়ালী নয় বৈরাগীদা। কঠোর নিষ্ঠুর সত্য। দেনার দায়ে বিকিয়ে গেছে খাসমহল, বিকিয়ে গেছে সবকিছু। এবার যেতে হবে।

বৈরাগী ঃ (কিছুক্ষণ নীরবতার পর) কোথায় যাবে ঠিক করেছ রাজাভাই ?

দর্প : আপাততঃ ভাবছি সদর রাস্তার চৌমাথায় আমাদের ঐ ঘণ্টাফটকে গিয়ে উঠব।

বৈরাগী : ঘণ্টাফটকে ?

দর্প : হ্যাঁ বৈরাগীদা। একটু আগেও মনে মনে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিলুম না কোথায় গিয়ে মাথা গুঁজি। হঠাৎ ঘণ্টাফটকটা ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে যেন আমাকে ডেকে বললে, 'এই তো, এই তো আমি আছি।' মনে পড়ে গেল, ওটা দেবত্তরের মধ্যে ; তাই বাঁধা পড়েনি।) সইসাবুদগুলো শেষ না হওয়া পর্যন্ত যে কদিন থাকতে হবে ভুবনপুরে,—ভাবছি ঐখানেই থাকব। ঘণ্টাফটকের ওপর লম্বা ঘর ;—ঘর বলতে দোষ কি তাকে ?) সেইখানেই বাস করা যাবে কিছুদিন।

বৈরাগী : তারপর ?

দর্প : তারপর, চলে যাব একদিন ভুবনপুর ছেড়ে।

বৈরাগী : রতনদিদি জেনেছে একথা ?

দর্প : আন্দাজ করছি, নিশ্চয়ই জেনেছে। আর তাই, আজ আর সর্বস্বান্ত ফতুর দর্পনারায়ণের জন্যে অপেক্ষা করারও দরকার মনে করেনি সে। দর্পনারায়ণকে বাদ দিয়েই তার নাচঘরে বেজে উঠেছে আজ সারেঙ্গী ; বেজে উঠেছে আজ বারোই কার্তিকের উৎসবের পাঁয়জোড়। শুনতে পাচ্ছ না ?

(নেপথ্যে ঘুঙুরের ও তবলার শব্দ স্পষ্টতর ও দ্রুততর হয়ে উঠল। দর্প চলে গেল। বৈরাগীদা একা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।]

তৃতীয় দৃশ্য

[ঘণ্টাফটকের উপরকার অপরিচ্ছন্ন জীর্ণ ঘর। ঘণ্টাদার বুড়ো বৃন্দাবনের সঙ্গে কথা কইতে কইতে দর্পর প্রবেশ।]

দর্প: তোর খুব অসুবিধে হচ্ছে, না রে বৃন্দাবন ?

বেন্দা: আজ্ঞে কৈ ? না তো হুজুর।

দর্প: বললেই কি আর আমি বিশ্বাস করব রে ? বেশ কেমন একা ছিলি এই ঘণ্টাফটকের ওপরে, হঠাৎ কোথা থেকে আমি এসে জুটলুম। আমার জন্যে তোকে রাঁধতে হচ্ছে, দুধ গরম করতে হচ্ছে, বিছানা পাততে হচ্ছে।

বেন্দা: হুজুর—

(চোখে কাপড় দিল)

দর্প: কাঁদছিস ? ভুবনপুরের হুজুরকে ঘণ্টাফটকে মাথা গুঁজতে দেখে কান্না পাচ্ছে তোর ?—থাকব না রে বেশিদিন। ঐ কাগজপত্রগুলো সইসাবুদ করে নেপাল রক্ষিতকে দখল দেবার জন্য যে-কটা দিন থাকতে হবে, সে-কটা দিন দিস থাকতে। তারপর চলে যাব।

বেন্দা: হুজুর—

দর্প: কি রে ?

বেন্দা: ঘণ্টা বাজাবার সময় হল হুজুর।

দর্প: ওঃ, হল বুঝি ?—যা। বাজিয়ে আবার আসিস, গল্প করব তোর সঙ্গে।

(বৃন্দাবন চলে গেল।—রাত ১০টা বাজল ঘণ্টায়। দর্প

চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় চোরের মত চুপিসাড়ে ঢুকল পঞ্চানন। একমুখ দাড়ি, ছিন্ন বেশ, উন্মাদের অবস্থা।]

দর্প ঃ কে ?—বেন্দা ?—কে—কে ওখানে ?

পঞ্চানন ঃ (দূরের অন্ধকার থেকেই) আমি।

দর্প ঃ কে তুমি ?

(পঞ্চানন ছুটে এসে পায়ের কাছে পড়ল। এতক্ষণে দেখা গেল তাকে।)

পঞ্চানন ঃ চেঁচাবেন না হুজুর, দোহাই আপনার। আমি পঞ্চানন।

দর্প ঃ পঞ্চানন ?

পঞ্চানন ঃ আপনি চিনবেন না। আপনার বাবা চিনতেন। কিন্তু আজ বোধহয় আমাকে দেখে তিনিও চিনতে পারতেন না। অনেক বদলে গেছি।

দর্প ঃ কি চাও ?

পঞ্চানন ঃ কিছু না, কিছ না।—~~আর~~ কিছু চাই না। কার জন্যে চাইব ? কেউ নেই আমার। শুনলুম, আর কদিনের মধ্যেই দলিলদস্তাবেজ দস্তখৎ কোরে সব কিছু নেপাল রক্ষিতকে দিয়ে চলে যাচ্ছেন ভুবনপুর ছেড়ে,—তাই এইবেলা দেনাটা শুধতে এলুম।

দর্প ঃ দেনা ? কিসের দেনা ? কার কাছে ?

পঞ্চানন ঃ আপনাদের কাছে হুজুর। সে দেনা কি শোধবার ! তবু এলুম। যদি কিছুটাও হাল্কা করতে পারি।

দর্প ঃ বুঝতে পারছি না তোমার কথা।

পঞ্চানন ঃ বলছি হুজুর, সব বলছি। কথাবার্তা আজকাল আর কেমন গুছিয়ে বলতে পারি না, ক্ষমাঘেন্না করে নেবেন।—আপনার বাবা একদিন আমাকে ভিক্ষে দিয়েছিলেন। অনেক টাকার ভিক্ষে। আমি আমার ব্যাটার নামে দিব্যি খেয়েছিলুম কি না, তাই ব্যাটার প্রাণ বাঁচাতে কেঁদে পড়েছিলুম তাঁর ছিচরণে। কিন্তু হল কি? সব ফক্কা! ব্যাটা আমার বাঁচল কৈ?—নেপাল রক্ষিত তাদের সবাইকে পুড়িয়ে মেরেছে।

দর্প ঃ এবার বোধ করি চিনতে পেরেছি তোমায়। গৌরগঞ্জে বাড়ি কি তোমার?

পঞ্চানন ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।

দর্প ঃ তুমিই তো ফেরারী আসামী?

পঞ্চানন ঃ হ্যাঁ।—না, না, না। রক্ষিত মহাজনকে খুন আমি করিনি হুজুর। রাগের মাথায় ওর গলাটা চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিয়েছিলুম বার কয়েক। কে জানত যে, হাঁপানীর রুগীটা তাইতেই মরে যাবে!—পালিয়ে গেলুম হুজুর সেই রাতেই। অনেকদিন পর একদিন লুকিয়ে-লুকিয়ে বাড়ির কাছে এসে দেখি, বাড়ির আমার চিহ্ন নেই হুজুর, ছাই হয়ে গেছে সব পুড়ে। নেপাল রক্ষিত সব পুড়িয়ে দিয়েছে। সেই পোড়া ছাই বুকে তুলে নিয়ে প্রতিজ্ঞা করলুম,—এর শোধ আমি নেবই।

দর্প ঃ শুনেছিলুম সব সরকারমশাইয়ের কাছ থেকে। সেই আগুনে তোমার বাড়ির সবাই মারা গিয়েছিল পুড়ে।

পঞ্চানন : কে বললে ? কে বললে ? মিছে কথা ! সবাই তো পোড়েনি।···সবাই পুড়েছে, পোড়েনি শুধু একজন। সে আমার ব্যাটার বৌ, আমার বৌমা। নেপাল রক্ষিত তাকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে—

দর্প : তাও শুনেছি।

পঞ্চানন : আর আমার জোয়ান্ মরদ ব্যাটা—

দর্প : সব শুনে পাগল হয়ে গেছে সে। তাও জানি। সরকারমশাই তহবিল থেকে মাসে মাসে তার চিকিৎসার জন্য টাকা পাঠাতেন কিছু কিছু।

পঞ্চানন : হ্যাঁ। আর, তাইতেই তো আপনাদের কাছে আমার দেনার ওপর বেড়ে গেল দেনা।—আমার সংসার পুড়িয়েছে নেপাল রক্ষিত, আমার ব্যাটাকে সে পাগল করেছে,—আমার ব্যাটার বৌকে সে,···! ওঃ, কতদিন ভেবেছি, তাকে খুন করে ফাঁসি যাব। কেন পারিনি জানেন ?

দর্প : কেন ?

পঞ্চানন : আপনাদের দেনা শোধ না করে মরব কি করে ? দেনদার হয়ে মরলে, সে যে ভীষণ নরক-জ্বালা ! আজ আপনাদের দেনা শোধবার সুযোগ পেয়েছি। এই নিন, —এই নিন,—

(পঞ্চানন বস্ত্রাভ্যন্তর থেকে এক গোছা দলিল বার করল)

দর্প : কী এগুলো ?

পঞ্চানন : দলিলপাটা।

দর্প : কিসের ?

পঞ্চানন : রক্ষিতদের কাছে আপনাদের যতকিছু কর্জের দলিলপাটা।—হ্যাঁ, হ্যাঁ, চুরি করে এনেছি আমি। চুরি করা পাপ ? কিন্তু নেপাল রক্ষিত যখন আমার ব্যাটার বৌকে চুরি করেছিল, তখন তো কই পাপ হয়নি তার !

দর্প : চুরি করলে কেন ?

পঞ্চানন : আপনাকে দেব বলে। দিয়ে আমার ঋণ শোধ করব বলে।—রক্ষিতদের কাছে আপনাদের দেনার প্রমাণ তো এই কাগজগুলো ? ঐ আলোয় এগুলো পুড়িয়ে ফেলুন হুজুর। যেমন করে আমার সংসার পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে নেপাল রক্ষিত,—ঠিক তেমনি করে। তারপর নেপাল রক্ষিত যখন ঢোল-সহরৎ কোরে দখল নিতে আসবে; তখন বুক ফুলিয়ে বলবেন,—'কিসের দেনা ? কার দেনা ? কোন প্রমাণ আছে ?'

দর্প : পঞ্চানন, তা' হয় না।

পঞ্চানন : কেন ?

দর্প : ও যে আমার পূর্বপুরুষের দেনা, আমার বাবার দেনা ! কাগজ পোড়ালেই কি আর সে দেনা মেটে ?—তা হয় না পঞ্চানন।

পঞ্চানন : কিন্তু হুজুর—

দর্প : এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই পঞ্চানন। এতবড় অন্যায় তুমি আমায় করতে বল কোন্ সাহসে ?

পঞ্চানন : অন্যায় !—কিসের ন্যায় ? কিসের অন্যায় ? কে

বিচার করছে ন্যায় অন্যায়ের ?—ওপরে ?—কিছু নেই, কেউ নেই। সব ফক্কা, মেকি, ঝুটো, মিথ্যে।

দর্প : পঞ্চানন !

পঞ্চানন : এই নিশুতি রাতে এখানে কে-ই বা জানতে পারছে একথা। শুধু আপনি আর আমি ছাড়া এই দলিল চুরির কথা সংসারে আর কেউ জানতে পারবে না কোনদিন।

(কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দর্প হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে)

দর্প : না, না, না। এ হতে পারে না, এ হতে পারে না, এ হতে পারে না। যে করে পার, যেমন করে পার, এ দলিল তুমি ফেরৎ দিয়ে এস পঞ্চানন। চলে যাও, চলে যাও, চলে যাও।—

(বলতে বলতে প্রস্থান করে দর্প। পঞ্চানন তাকে অনুসরণ করতে করতে বলতে থাকে—)

পঞ্চানন : কিন্তু আপনাদের কাছে আমার ঋণ ? সে কি তাহলে কোনদিন শোধ হবে না ?—ঋণ শুধতে না পারলে আমার যে মরা হচ্ছে না, নেপাল রক্ষিতকে মারা হচ্ছে না।

———

চতুর্থ দৃশ্য

[বাঈমহলের নাচঘর। রতনবাঈ একা বসে তানপুরায় টুং টাং করছিল। নিতাই ঢুকল। গায়ে আজ সে কোট চাপিয়েছে একটা, কোমরে বেঁধেছে সাদা চাদর।]

নিতাই : রতন দিদি।

রত্না : ওঃ, নিতাইদা,—কি রে ? এখনি চললি ?

নিতাই : হ্যাঁ দিদি। গোরুর গাড়িতে মালপত্তর উঠে গেছে। ছই খাটাচ্ছে গাড়োয়ান।

রত্না : ওঃ ! তা' হ্যাঁরে, খাসমহলের নায়েবমশাই, গঙ্গাপ্রসাদ সরকার মশাই, সবাই নাকি চলে গেছেন ভুবনপুর ছেড়ে ?

নিতাই : না দিদি, যাননি এখনো। আমরা তো একসঙ্গেই যাচ্ছি আজ।

রত্না : ওঁদের মত তুইও কি আর ফিরবি না ?

নিতাই : সে কি কথা দিদি ? আমি ফিরব না কেন ? আমার দিদি যে রইল এখানে। অনেকদিন দেশঘরে যাইনি, ওনারা সব যাচ্ছেন, তাই কিছুদিনের জন্যে—

রত্না : একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে চেষ্টা করিস নিতাইদা।

নিতাই : নিশ্চয়ই তাড়াতাড়ি ফিরব দিদি।

রত্না : যাবার সময় একবার ঘণ্টাফটকে হয়ে যাবি না নিতাইদা ?

নিতাই : যাব বৈকি। নিশ্চয়ই যাব।—এ সময়ে তুমিও কিন্তু একবার অন্তত গেলে পারতে দিদি।

রত্না ঃ   কোথায় ?   ঐ ঘণ্টাফটকে ?

নিতাই ঃ   হ্যাঁ।   মানুষটা একেবারে একা।

রত্না ঃ   কিন্তু রাগ কোরে ঘণ্টাফটকে চলে যাওয়ার আগে ওরই কি উচিত ছিল না আমাকে বলে যাওয়া ?   কেন ?   ঐ ভাঙ্গা ফটকে না থেকে পারত না কি এখানে এসে উঠতে ? এ যা কিছু সব, তা-কি ওর নয় ?—ইজ্জতে বাধে, বুঝলি নিতাইদা,—এখানে এসে থাকলে ওদের অপমান হয়।

নিতাই ঃ   ওঁর মনের অবস্থাটার কথা ভেবো দিদি।

রত্না ঃ   আর আমার মনের অবস্থা ?   কে ভাবছে সেকথা ? কী দোষ করেছি আমি যে, আমাকে না জানিয়ে সটান ঘণ্টাফটকে গিয়ে উঠলো ?   রোজ দুবেলা নিজে হাতে রেঁধে থালা সাজিয়ে খাবার পাঠাই ওর ঘণ্টাফটকে।   কিন্তু কই,—বৃন্দাবনকে একবার জিজ্ঞেস করেনি তো, রত্না কেমন আছে ?

নিতাই ঃ   উনি জানেন বৃন্দাবনই রাঁধে খাবার।   তুমি রেঁধে পাঠাও, কেমন করে জানবেন বল ?   বৃন্দাবনকে সেকথা বলতে তুমিই তো বারণ করে দিয়েছ দিদি।

রত্না ঃ   করলেই বা বারণ।   খাবারের স্বাদ-বর্ণ দেখে বুঝতে পারে না সে ?   বুঝতে পারে না যে, এ রান্না বৃন্দাবনের হতে পারে না ?   সংসারে আর কে আছে ওর আমি ছাড়া, যে ওকে এত যত্ন করে রেঁধে খাওয়াবে ?   বুঝতে সবই পারে নিতাইদা, বুঝতে চায় না।   ইচ্ছে করেই বুঝতে চায় না।

নিতাই : দিদি, আমি চাকর-নফর মানুষ। তোমায় এতটুকুনটি থেকে দেখেছি, তারই জোরে বললুম এত কথা। দোষ নিও না দিদি। আজ এখন চলি ?

রত্না : যাচ্ছিস ? দাঁড়া নিতাইদা। (গলার হারছড়া খুলে) এটা তোর নাতনীকে দিস।

নিতাই : না, না দিদি। আবার এসব কেন ? কত কীই তো দিয়েছ। আর কত নেব ?

রত্না : নিয়ে যা নিতাইদা। (জোর করে দিয়ে দেয়) বলিস, তার দিদি দিয়েছে।

নিতাই : চলি দিদি।

রত্না : আয়।

(নিতাই চলে গেল। তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে রত্না কিছুক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর আবার এসে তানপুরা তুলে বাজাতে বাজাতে করুণ গান ধরল একটা। গানটা যখন মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছেছে, রত্না'র অলক্ষ্যে নেপাল এসে দাঁড়াল দরজায়। গান শেষ হতেই হাততালি দিয়ে নেপাল বললে—)

নেপাল : বলিহারি।

রত্না : (চমকে) কে ? কে আপনি ?

নেপাল : আমি ?—হুঃ হুঁঃ হুঁঃ !

রত্না : কে আপনি ?

নেপাল : তোমার গলার আওয়াজটা ভারী মিঠে কিন্তু !

রত্না : ভুখন্ সিং।

নেপাল ঃ পরিচয় দিলে এ-অধমকে তোমার ভালই লাগবে সুন্দরী। আমারই নাম নেপাল রক্ষিত।

রত্না ঃ এখানে কেন এসেছেন?

নেপাল ঃ তত্ত্বকথা শোনবার জন্যে নয় নিশ্চয়ই প্রিয়ে।

রত্না ঃ আপনার সাহস—

নেপাল ঃ একটু অসাধারণ।—নাচঘরটা কিন্তু দিব্যি। রায়েদের পয়সা না থাক, মেজাজ ছিল।

রত্না ঃ বেরিয়ে যান। যান বলছি।

নেপাল ঃ মনে আছে বোধহয়, আমারই নাম নেপাল রক্ষিত।

রত্না ঃ মনে আছে।

নেপাল ঃ তবু চলে যেতে হবে? এটা কিন্তু অবিচার হচ্ছে না সুন্দরী?

রত্না ঃ আপনি যাবেন কি না?

নেপাল ঃ রায়-মহারাজেরা কত দিত, তোমাদের এক সন্ধ্যের খরচ? তার ডবল পাবে।

রত্না ঃ ভুখন্ সিং।

নেপাল ঃ জানো বোধহয়, ভুবনপুরের রায়েদের সব কিছুই এখন আমার?

রত্না ঃ জানি। আর, এও বোধহয় আপনার জানা আছে যে, বাঈমহলের সম্পত্তি রায়েদের জমিদারির বাইরে?

নেপাল ঃ হ্যাঁ, জানি বৈকি। দেবত্তর সম্পত্তির মত এটা যে বাঈজীত্তর সম্পত্তি তা জানি। কিন্তু খাসমহলের কর্তারাই তো পুরুষানুক্রমে এই নাচমহলের একমাত্র অতিথি হয়ে

এসেছেন,—তাই না ? তা খাসমহলের বর্তমান কর্তা নেপাল রক্ষিত কী এমন অপরাধ করলে প্রিয়ে ?

(ভুখন সিং-এর প্রবেশ)

রত্না ঃ এই যে ভুখন সিং, কোথায় থাকিস ? এই বেআদপটাকে নিচে নামার সিঁড়িটা দেখিয়ে দিস।

(রত্নার প্রস্থান। ভুখন আদবকায়দার সঙ্গে হেঁট হয়ে দরজার দিকে হাত বাড়িয়ে নেপালকে বেরিয়ে যাবার ইঙ্গিত করল। নেপাল রত্নার দৃপ্ত ভঙ্গিতে চলে যাওয়ার পথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল।)

ভুখন্ ঃ বাবুজী।

নেপাল ঃ (চমক ভেঙ্গে) উঁ ?—'ওঃ !

(নেপাল চারটে রূপোর গোল টাকা তুলে দিলে ভুখনের হাতে। ভুখন টাকা পেয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে মস্ত সেলাম ঠুকল।)

নেপাল ঃ তোদের মাঈজী হঠাৎ এমন গোঁসা করলেন কেন বল্‌তো ভুখন্ ?

ভুখন ঃ ক্যা জানে জী। হাম তো এঁহা নয়া আদমী হজৌর।

নেপাল ঃ ওঃ ! নতুন বহাল হয়েছিস্ ?—ব্যাপারটা কিছু বোঝা গেল না। আচ্ছা, জানিয়ে রাখিস্ তোদের মাঈজীকে, আমি আবার আসবো ;—তৈরী হয়েই আসবো।

(পকেট থেকে একটা মুক্তোর হার তুলে ধরল নেপাল।)

নেপাল ঃ এটা তোদের মাঈজীকে······আচ্ছা থাক, সেদিন নিজে এসেই দিয়ে যাবখন্।—চল্।

(ভুখন সিং আবার সসম্ভ্রমে হেঁট হয়ে হাত বাড়িয়ে পথ দেখায়। নেপাল বেরিয়ে যায়।)

পঞ্চম দৃশ্য

[ঘণ্টাফটকের ঘর। স্বল্পালোকিত সেই জীর্ণ ঘরে একা দাঁড়িয়ে বেহালা বাজাচ্ছিল দর্প। বৈরাগী ঢুকে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ডাক দিলে—)

বৈরাগী : রাজাভাই।

(বেহালা থামিয়ে ফিরে তাকাব দর্প)

দর্প : এসো বৈরাগীদা, এসো।—কোথায় বসতে দিই তোমায় বলতো ?

বৈরাগী : ঠিক আছি রাজাভাই।

দর্প : রাজাভাই বলে আর ডেকো না বৈরাগীদা, লোকে শুনলে হাসবে।

বৈরাগী : আমার যে প্রাণের ঠাকুর, সে যে মথুরার রাজপাটে না বসেই রাজা হয় গো ;—বৃন্দাবনের রাখাল রাজা।

দর্প : বেশ আছ তুমি বৈরাগীদা। তোমার নেই কিছু, তাই হারায়ও না কিছু।

বৈরাগী : একটা কথা তোমায় বলতে এসেছিলুম রাজাভাই। কাজের কথা।

দর্প : কাজের কথা ? কেজো লোকের দল থেকে তুমি তো চিরকালই আলাদা। তুমিও শেষ অবধি কাজের কথা বলতে এলে ?—বল।

বৈরাগী : রাজাভাই, রাজ্যপাট চলে গেলেই কি রাজার দায়িত্ব চলে যায় ?

দর্প: দায়িত্ব? আমার?

বৈরাগী: হ্যাঁ রাজাভাই। বাঈমহলের দায়িত্ব।

দর্প: বাঈমহলের! বাঈমহলের দায়িত্ব তো চিরকালই খাসমহলের মালিকের।

বৈরাগী: আর রতনের? রতনবাঈ জয়পুরীর? তোমার রত্নার?

(দর্প চুপ করে থাকে। কেমন বিচলিত হয়ে যায়। পিছন ফিরে দাঁড়ায়।]

বৈরাগী: আমার এখনো মনে পড়ে রাজাভাই, অনেকদিন আগে রতনের পায়ে ছোট্ট একটা কাঁকড়া বিছে কামড়াতে একটি ছেলে ছুটে গিয়েছিল আমার কাছে,—চোখে তার জল,—বার বার শুধিয়েছিল, রতনের কষ্ট কতক্ষণে কমবে বৈরাগীদা?—ছেলেটির নাম দর্পনারায়ণ।

(দর্প তেমনি পিছন ফিরে চুপ করে থাকে)

বৈরাগী: ঘণ্টাফটকের ঘড়িতে আজো সাতটা বাজে। ঘণ্টাফটকে দাঁড়িয়ে তুমি হয়ত শুনতে পাও না রাজাভাই,—সাতটার ঘণ্টা তাই তোমাকে মনে পড়িয়ে দেয় না কারুর কথা। একজন কিন্তু ঠিক শুনতে পায়। চোখ দুটো তার ছোট;—মনটা তার চেয়েও। তার নাম নেপাল রক্ষিত।

(দর্প ঘুরে দাঁড়ায় এবার)

বৈরাগী: সেই নেপাল রক্ষিত একদিন গিয়ে উঠেছিল রতনের কামরায়।

দর্প : ওঃ !

বৈরাগী : শুনেও তুমি নিশ্চিন্ত ?

দর্প : খাসমহলের নতুন মালিক হয়ে যে এসেছে, তার অনেক পয়সা,—অরসিকও সে হবে না নিশ্চয়ই। রতনবাঈ খুশিই হবে।

বৈরাগী : রাজাভাই ! তুমি কি সত্যিই সর্বস্বান্ত হলে শেষ পর্যন্ত ! তোমার সেই সুন্দর মনটাকে এমন কোরে তুমি কার কাছে বিকিয়ে দিলে ? এমন কথাটা উচ্চারণ করতে পারলে তুমি !—একটু আগেই তুমি বলছিলে রাজাভাই, আমার কিছু নেই, তাই আমার কিছু হারায় না। কিন্তু ছিল আমার রাজাভাই, রাজার ঐশ্বর্য ! আজ এই মুহূর্তে আমি তাই হারালাম।—চলি রাজাভাই, চলি।

দর্প : তুমি কি একটা বলতে এসেছিলে, সেটা না বলেই চলে যাচ্ছ।

বৈরাগী : যাকে বলতে এসেছিলুম, তাকেই যে আর পেলুম খুঁজে।

দর্প : নেপাল রক্ষিত কি খুব বিরক্ত করছে বাঈমহলে গিয়ে ? অসভ্যতা, বেয়াদপী করেছে কিছু ?

বৈরাগী : করলেই বা।—খাসমহলের নতুন মালিক সে।

দর্প : সে কি বাঈমহলের অন্দরে ঢুকেছে ?

বৈরাগী : ঢোকেই যদি, তাতে তোমার কি এসে যায় ভাই ?

দর্প : (হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে) তুমি বলবে কি না ?

বৈরাগী : (শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে) না। যদি মনে করো,

বাঈমহলের সেই মেয়েটির শুচিতা সম্ভ্রম সম্মানের কিছুমাত্র দায়িত্ব আছে তোমার,—খোঁজ নিও তার নিজে। তারপরে যদি মনে করো, কিছু করা উচিত তোমার,—কোরো। আমি আজ তোমায় কিছু বলব না।—চলি রাজাভাই।

(বৈরাগী চলে যায়। দর্প স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বাইরে ঝড়ের শব্দ ওঠে। ঝড়ের শব্দটা বাড়তে থাকে। ধীরে ধীরে ষ্টেজ অন্ধকার হয়ে আসে।)

ষষ্ঠ দৃশ্য

[বাঈমহলের নাচঘর। রাত। বাইরে ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। রত্নার ভীতি ব্যাকুল আর্তনাদ দিয়ে সুরু হল দৃশ্য। মঞ্চের আলো জ্বলে উঠতেই রত্না বাইরে থেকে ছুটে পালিয়ে এসে নাচঘরে ঢুকে কোন একটা আসবাবে ঠেস দিয়ে হাঁফাতে লাগল। মাতাল নেপাল তার পশ্চাদ্ধাবন কোরে ঘরে ঢুকে ঘরের মাঝখানে টলমলে পায়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। এক হাতে তার মদের বোতল, অন্য হাত প্রসারিত করে দেওয়া রত্নার দিকে।]

নেপাল ঃ এতক্ষণ ধরে তো সারা বাঈমহল ঘুরে ঘুরে চোর-চোর খেলা হল,—এবার একটু 'আব্বা' দাও ভাই, জিরিয়ে নিই। মাইরি বলছি, বড্ড হাঁপিয়ে গেছি।

(টলতে টলতে পিছু হটে দরজার কাছে দুহাত প্রসারিত করে দাঁড়াল।)

নেপাল ঃ বুড়ি আগ্‌লে দাঁড়িয়েছি বাবা, পালাতে দিচ্ছিনে। (মদ ঢালল গলায়) আঃ-আ-আঃ! হবে নাকি ভাই? দু-চার ফোঁটা? একটু নেবে নাকি ভিজিয়ে টুকটুকে ঐ রাঙা ঠোঁটদুটি? নেবে না কি আর একটু মিষ্টি কোরে? য়্যাঁ? বল না মাইরি!

রত্না ঃ ভুখন্ সিং—

নেপাল ঃ কোনও সিং-ই আজ আর শিং নেড়ে তেড়ে আসবে না ভাই। দেখলে তো এতক্ষণ চেঁচিয়ে। আজ রাত্রে তোমার বাঈমহলে কেউ জেগে নেই। ওদের ঘুম কাল

সকালের আগে ভাঙছে না। অবিশ্যি ভুখন্ সাহায্য না করলে আমার একার দ্বারা এসব সম্ভব হত না।—ওকে ভাবছি আমার খাসমহলের সেপাই করে দেব। কি বল? কাজের লোক। তাই না?

(বোতলটাকে একপাশে নামিয়ে রেখে এবার টলতে টলতে এগোতে থাকে রত্নার দিকে।)

রত্না : খবরদার, কাছে এস না বলছি।

নেপাল : হাঁড়ির সাপ, সেও ফোঁস্ করে রে! (হাসি)

রত্না : পায়ে পড়ি, পায়ে পড়ি তোমার,—ছেড়ে দাও।

নেপাল : ওমা! ফোঁস্ ছেড়ে সাপ আবার কাঁদে যে রে!—হাঃ হাঃ হাঃ!—আচ্ছা, কেন অমন করছ মাইরি? রাগ-ফাগ না করে মুখ তুলে তাকাও না ভাই একটু। (ভাঙ্গাগলায় গান ধরে)—

"চাও চাও বদন তোলো
কথা কও মুচকি হেসে।"

(এগোচ্ছে নেপাল। রত্না সিঁটিয়ে যাচ্ছে। এগোতে এগোতে নেপাল হাত বাড়িয়ে মুঠো কোরে ধরে ফেলল রত্নার ওড়নার প্রান্ত। রত্না ছুটে অন্ধকারে চলে গেল। ওড়নাটা উঠে এল নেপালের হাতে। ওড়নাটাকে হাওয়ায় দুলিয়ে দুলিয়ে হো হো করে হাসতে লাগল নেপাল; আর বেসুরো গলায় গাইতে লাগল—)

নেপাল :

বাবলার ফুল লো,
কানে লো দুলালি।
মুড়ি-মুড়কির নাম রেখেছে
রূপালী-সোনালী॥
বাবলার ফুল লো।—

(হঠাৎ বন্দুকের শব্দ! নেপালের গান থেমে গেল। নিজের একদিকের কাঁধ চেপে ধরে পড়ে গেল সে মাঝখানের বিছানার উপর! ঢুকল দর্প। হাতে বন্দুক। দর্পকে দেখতে পেয়েই রত্না ছুটে এসে আগে কেড়ে নিয়ে ফেলে দিলে বন্দুকটা।)

রত্না : দর্প! দর্প, তুমি এসেছ!—কিন্তু এ তুমি কী করলে দর্প? এ কী করলে?

দর্প : কিছুই হয়নি ওর রত্না,—সামান্য আঘাত লেগেছে শুধু কাঁধে। আমার বন্দুক দাও।

রত্না : ওগো না, সে সর্বনাশ আর কোর না। তুমি যাও, তুমি পালাও।

দর্প : একা চলে যাবার জন্য আমি আসিনি রত্না।

রত্না : দর্প!

দর্প : রত্না, আমার পূর্বপুরুষরা গড়ে গিয়েছিলেন দু-দুটো মহল। আমার মহল আমি হারিয়েছি। তোমার মহল পারবে তুমি ছেড়ে চলে যেতে? পারবে?

রত্না : কোথায়?

দর্প : নাম-না-জানা কোন গ্রামে, নাম-না-জানা কোন নদীর পারে,—আমার ছোট্ট ঘরের ঘরণী হয়ে?

রত্না : কিন্তু দর্প—?

দর্প : জানি, জানি রত্না, সারা ভুবনপুর কাল সকালে ভরে উঠবে রায়বংশের কুলাঙ্গারের অপযশে। সমাজ ছি-ছি করবে। কিন্তু রত্না, আমি জানি, বৈরাগীদা খুশি হবে। আর, আমাদের অনেক দিনের অনেক ইতিহাসের সাক্ষী

ঐ ঘণ্টাফটকও খুশি হবে নিশ্চয়ই। সে অন্তত বুঝবে,—তোমাকে গ্রহণ কোরে রায়বংশের ছেলে কোন অন্যায়, কোন অধর্ম করেনি।—চলে এস রত্না।

(রত্নার হাত ধরে দর্প প্রস্থান করে। এতক্ষণে নড়েচড়ে ওঠে নেপাল। হাতে ভর দিয়ে মুখ তুলে যন্ত্রণা বিকৃত কণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে—)

নেপাল : কে আছিস ? আটক কর। আটক কর ওদের। —কে ? কে ওখানে ?—

(দরজার সামনে ভূতের মত এসে দাঁড়াল পঞ্চানন। চোখ দুটো তার জ্বলছে। দর্পর বন্দুকটা পড়েছিল মেঝেয়। নেপাল হাত বাড়িয়ে সেটা ধরতে যেতেই পা দিয়ে বন্দুকটাকে সরিয়ে দিয়ে পঞ্চানন হেসে উঠল উন্মাদের মত, —হাঃ ! হাঃ ! হাঃ !)

॥ যবনিকা ॥